ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২০ সংখ্যা ।। ২৬ পৌষ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১১ জানুয়ারি, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

সি পি এমে ধর্মের ভিত্তিতে পদের দাবী

নেতৃত্ব দখলের চ্যালেঞ্জ মুসলিম নেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মুসলমান বলেই এতদিন জামাই আদর করা হোত পার্টিতে। সেই তোষণের কারবারকে নিজেদের অধিকার মনে করে সিপিএমের অন্দরে মুসলমান নেতারা এবার ধর্মের ভিত্তিতে পার্টি ও সরকারে বড় বড় পদ চাইছেন। এতে রীতিমতো দিশেহারা বিমান বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা। সিপিএমের একেবারে জোনাল কমিটি স্তর থেকে রাজ্য কমিটি পর্যন্ত মুসলিম নেতারা দাবী তুলেছেন, দলে মুসলমানদের ভারী ভারী পদ দেওয়া হচ্ছে না। তা দিতে হবে। আগে দলে ও সরকারে নিজেদের ধর্মীয় ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে তারপর মুসলমানদের জন্য সার্বিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই তাঁদের লক্ষ্য। সিপিএম নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি হিসাবে দাবী করে থাকে। কিন্তু দলের মুসলিম নেতারা যেভাবে প্রকাশ্যে ৩৩ বছরের সিপিএম জমানায় তাদের বঞ্চিত থাকার কথা বলে সোচ্চার হচ্ছেন তাতে দলের নেতারা আতঙ্কিত। সিপিএমের মধ্যেই অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু লাইন এবং মুসলিম লাইন আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। সিপিএমের মুসলিম নেতাদের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন রেজ্জাক মোল্লা। তাঁর নিজের এলাকা ক্যানিংয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। এখন নিজে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। তাঁকে মদত জোগাচ্ছেন বিধানসভার স্পীকার হাসিম আব্দুল হালিম। রয়েছেন সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুল সাত্তার। এঁদেরই অনুগামী বিভিন্ন জেলার নেতারা মুসলমানদের দলে গুরুত্ব দেওয়ার দাবী জানাচ্ছেন এই শক্তিশালী লবির নেতাদের জন্য। মুসলিমরা এতদিন অন্ধের মতো সিপিএমকে ভোট দিয়েছে। সিপিএম তাদের জন্য মড়ার কান্না কেঁদেছে। কিন্তু মুসলিমদের কোনও উপকার করেনি। এখন

(এরপর ৪ পাতায়)

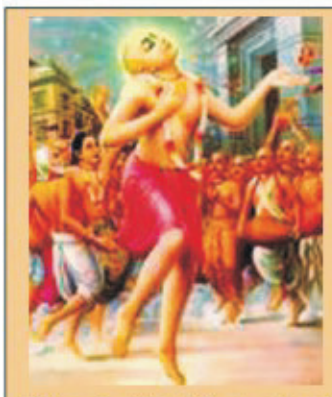

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের ৫০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শুরু হচ্ছে এক মহাসংকীর্তন যাত্রা – কাটোয়া থেকে পুরীধাম। এই যাত্রা ১৯ জানুয়ারি শুরু হয়ে শেষ হবে নীলাচলে – ১৪ ফেব্রুয়ারি। মহাপ্রভুর এই মহাসংকীর্তন যাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি তথ্যনিষ্ঠ মননশীল রচনা ভিতরের পাতায় প্রকাশ করা হলো।

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের নথিপত্র লোপাট

খুনের মামলার দণ্ডিত আসামী শিল্পমন্ত্রীর পদে

গূঢ়পুরুষ।। বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের কীভাবে পিছনের দরজা দিয়ে গোপনে জ্যোতিবাবু-বুদ্ধদেববাবুরা জেলের বাইরে এনেছিলেন এবং প্রশাসন ও পার্টিতে উচ্চপদে বসিয়ে ছিলেন তার বিবরণ আগেই স্বস্তিকায় গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই কলকাতার সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে চাপান উতোর শুরু হয়েছে। অনেকেই তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন বিচারের নথিপত্র সরকারি হেফাজতে আছে কী না। স্বস্তিকার বিগত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের বিচারের নথিপত্র, পুলিশের দেওয়া চার্জশিট ইত্যাদি সবই ঝাড়ু মেরে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই তা করা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জ্ঞাতসারে। সেই কথাই বর্ধমানের বর্তমান পুলিশ সুপার রাজশেখরণ একটু ঘুরিয়ে বলেছেন যে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের নথিপত্রের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। কীভাবে নথিপত্র নিখোঁজ হয়েছে তাও জানা যাচ্ছে না।

নথিপত্র নিখোঁজ হওয়ার পিছনে যে সিপিএম নেতৃত্বের অদৃশ্য হতে আছে তা বুঝতে অসুবিধা নেই। কারণ, নথিপত্র পাকাপাকিভাবে নষ্ট করার পরেই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান আসামী এবং রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ১৯৯৬ সালে বিধানসভার নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী হন। দেশের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রার্থীদের লিখিতভাবে জানাতে হয় যে অতীতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা ছিল কী না এবং থাকলে সেই মামলায় তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন কী না...ইত্যাদি। ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত আসামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে না। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৬ সালে তিনবার রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং জয়ী হন। এই তিনবারই মনোনয়ন পত্রে উল্লেখ করেননি যে তিনি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ছিলেন। সরকারি নির্দেশে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেয়। আদালতে কখনও প্রমাণিত হয়নি যে তিনি নিরপরাধ। নিঃসন্দেহে তথ্য গোপন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীও হন। বিষয়টি নিয়ে বিরোধী

(এরপর ৪ পাতায়)

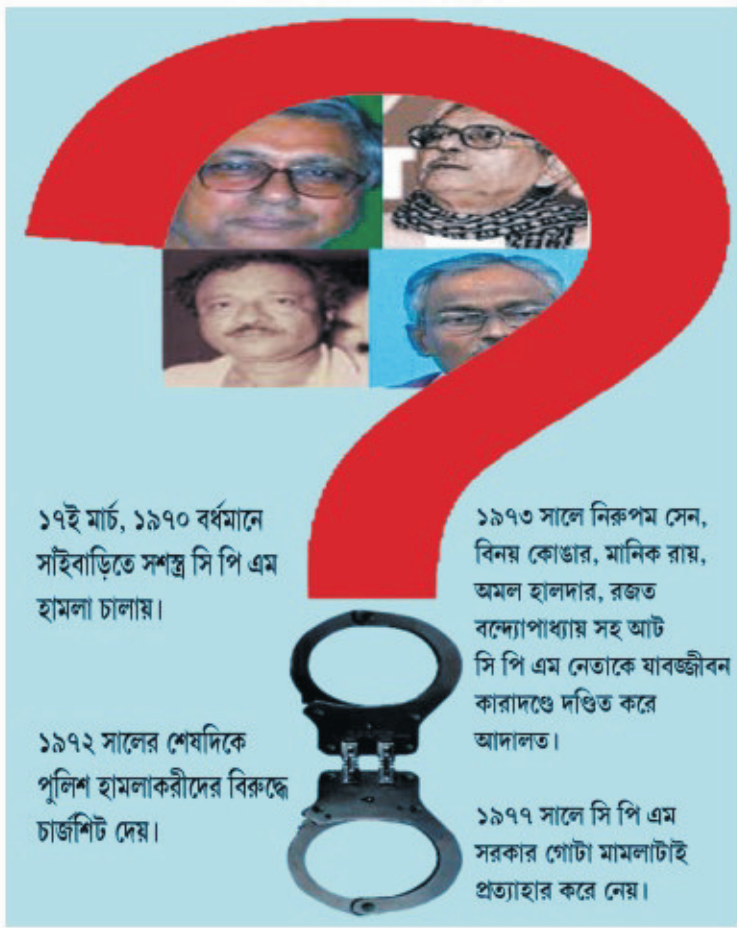

ইডেনে বিদ্যুৎ বিভ্রাট - ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোনোর অপেক্ষায়

অর্ণব নাগ।। সেই ইডেন গার্ডেন্স। আবার একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ। সেই কেলেঙ্কারী (এবারে বিদ্যুৎ)। আবার 'কিং'বদন্তী লড়াই। ইডেনে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দশদিনের মাথায় সিএবি

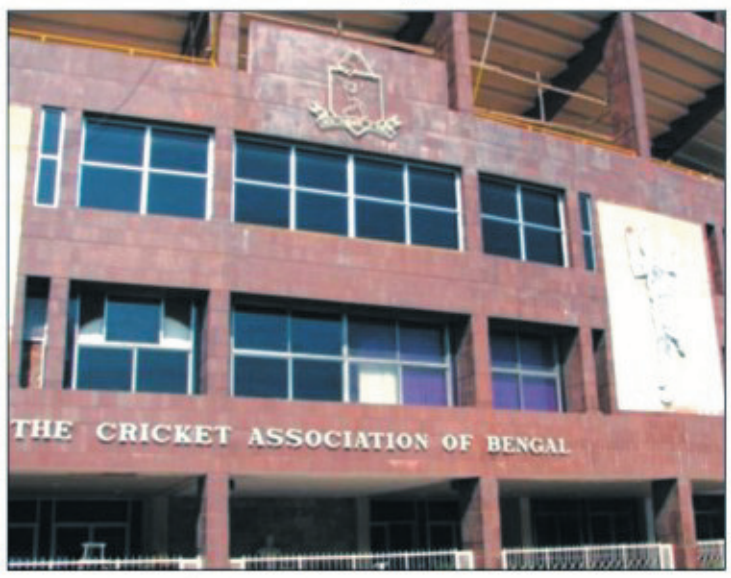

কলকাতা পুলিশ। সর্বোপরি সেই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল এবং আবার ডালমিয়া বনাম বুদ্ধের অনৈতিহাসিক সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া এই প্রতিবেদককে স্বয়ং জানালেন, ''আগামী দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই সবকিছু 'ক্লিয়ার' হয়ে যাবে।'' ওই ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরেই পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তীর সি এ বি-কে হুঁশিয়ারী আর নিয়ম-নীতির পরোয়া না করেই তাঁর অধীনস্থ আই পি এস অফিসার দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন করেছিলেন। আর এই কারণে গৌতমমোহনের মধ্যে যুগপৎ প্রাক্তন সি এ বি প্রধান ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায়-এর ছায়া দেখছিলেন অনেকেই। যদিও দেবাশীষবাবুর 'তদন্ত রিপোর্ট' ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছে হিমঘরে। গৌতমরূপী 'প্রসূন'-এর জন্য এবার বুদ্ধবাবুর হয়ে ময়দানে নেমেছিলেন গৌতম অগ্রজ রাজ্যের মুখ্যসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু সেবারের সাথে এবারের তফাত হলো বিসিসিআই (ভারতের সর্বোচ্চ ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা)-কে ২০০৭-এ পাশে পেয়েছিলেন বুদ্ধ অ্যান্ড কোং। এবার তাঁরা বিসিসিআই-কে ততটা পাশে পাবার আশা করছেন না। সি এ বি-র ডালমিয়া ঘনিষ্ঠ মহল মনে করছে যে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা স্টেডিয়ামের পিচ কেলেঙ্কারীর পর আই সি সি-র ধ্যাতানি খেয়ে রীতিমতো ব্যাকফুটে রয়েছে বিসিসিআই। তারপর ডালমিয়ার পয়লা নম্বরের শত্রু ললিত মোদী নিজের রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থায় সভাপতি পদে হারার পর ডালমিয়ার সঙ্গে পরোক্ষে সমঝোতাই চাইছেন। সেই কারণে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি 'অনায়াসেই' টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করার দায়িত্ব পেয়েছে ইডেন। সিএবি-র যুগ্ম সচিব অরুণ কুমার মিত্র জানালেন—''এখনও বিসিসিআই-এর স্যাংশন লেটার আমরা হাতে পাইনি। পাওয়ার পর পুলিশী অনুমতি নেব।'' সিএবি-র একটা সূত্র বলছে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ডালমিয়ার পক্ষে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও অনুকূল হয়েছে বুঝেই রাজ্য সরকারের বকলমে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে যাবে না তারা। বরং একটা কমিটি মতোন গড়ে ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের টেস্টের জন্য কলকাতা পুলিশের সুপারিশগুলোই প্রকারান্তরে মেনে নেবে সিএবি। সিএবি-র আশা টেস্ট ম্যাচে

(এরপর ৪ পাতায়)

খোদ মুখ্যমন্ত্রীই বলছেন

কিষেণজীকে ধরা কঠিন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ বনাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর চাপান উতোর চলছে। চিদাম্বরম্-প্রণববাবুদের কথায় পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। আর বুদ্ধ বাবু তাকে অস্বীকার না করে সিপিএম-এর দলীয় মুখপত্র 'গণশক্তির' বার্ষিকী উদ্‌যাপন সভাতে বলেছেন, চিদম্বরম্‌রা 'তেলেঙ্গানা' রাজ্যের দাবী সমর্থন করাতেই পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও ডুয়ার্সে পৃথক রাজ্যের দাবী জোরদার হয়েছে। যৌথবাহিনী নামানো সত্ত্বেও মাওবাদীদের হাতে জঙ্গলমহল এলাকার দখল চলে যাওয়া। বুদ্ধ বাবু, বিমানবাবু প্রমুখ সিপিএম নেতারা বরাবর মাওবাদীদের তৃণমূলের দোসর বলছেন কখনও নাম করে, কখনও বা আকারে ইঙ্গিতে। অথচ ঘটনা হ'ল—মাওবাদীরা সিপিএম-এর স্বাভাবিক মিত্র। উভয়েই মাও (চীন) পন্থী। গত কয়েকবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের যে দাপাদাপি চলছে তার পেছনে যিনি মুখ্য, তার নাম কিষেণজী ওরফে কোটেশ্বর রাও। তিনি নিত্য নিয়মিত কলকাতার সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দেন ফোনে এবং পিছন থেকে নেওয়া মুভি ক্যামেরায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বা যৌথবাহিনী আজও তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। সম্প্রতি তিনি রাজ্য সরকারের পরিবেশ বিভাগের প্রধান সচিব মদনলাল মীনার সঙ্গে সরাসরি ফোনে কথা বলেছেন। মীনা তিরস্কৃত হয়েছেন। আর বুদ্ধ বাবু বলে দিয়েছেন, কিষেণজীকে ধরা সম্ভব নয়। গতবছর মে-মাসে কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিককে জঙ্গলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিষেণজী জানিয়েছিলেন, মাওবাদীদেরকে সিপিএমই ডেকে এনেছে। ২০০০-২০০১-এ তৃণমূল-বিজেপি জোটকে গড়বেতা-কেশপুরে থেকে উৎখাত করতেই তাদের ডাকা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীদের ধ্বংসাত্মক গতিবিধি প্রথম প্রকাশ্যে আসে ২০০৪-এর ডিসেম্বরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ি থানার অন্তর্গত কাঁকরাঝোর বনবাংলো ভস্মীভূত করার ঘটনায়। তারপর থেকে লালগড় ও বাঁকিশোলের জঙ্গলে মাইন বিস্ফোরণে পুলিশ ও ই এফ আর জওয়ানদের মৃত্যু ঘটে। সন্দেহের তীর মাওবাদীদের দিকেই। ২০০৬-এ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার অজয় নন্দা রাজ্য সরকারের কাছে কিষেণজীর হাইড-আউট ও গতিবিধি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্টে বলেছেন—২০০৬ এ কিষেণজী কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে বাগুইহাটিতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। উদ্দেশ্য কলকাতায় মাওবাদীদের জন্য তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাড় করা। তাতে তিনি বেশ সফল। কেননা খোদ তাত্ত্বিক মুখ্যমন্ত্রীই তার উপর বরদহস্ত। গত ২৭ ডিসেম্বর বুদ্ধ বাবু বলেছেন, কিষেণজীকে খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এই সময়

কষ্টিপাথর

এক ভারতীয় মা-এর মাধ্যমে পালিতা তাঁর দুই শিশু সন্তানকে ঘরে প্রত্যাবর্তন করাতে আন্তরিকভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন এক জার্মান, নাম জান বালাজ। ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ওই ভদ্রলোকের পিতৃপরিচয় নিয়ে সন্দিহান না থাকলেও পিতৃত্বের কর্তব্য নিয়ে আগাগোড়া সংশয়ী ছিলেন। সেই সংশয় কাটাতেই জান বালাজ তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখলেন জার্মানীর ভারতীয় দূতাবাসে। পাসপোর্ট নামক কষ্টিপাথরে বালাজ-কে বিচার করে সুপ্রিম কোর্ট দুই শিশু সন্তানকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শেষপর্যন্ত 'পিতৃত্বের অধিকারে'ই আস্থাজ্ঞাপন করলেন।

কায়া ও ছায়া

ইয়েমেনে সরকারি প্রচেষ্টায় আল কায়দা ক্রমশ ক্ষীণতনু হতে হতে ছায়ায় পরিণত হচ্ছে। গত ৪ জানুয়ারি পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই-এ দুই আল কায়েদা জঙ্গি নিহত হন এবং একজন গুরুতর আহত হন। ইতিপূর্বে ইয়েমেনের মার্কিন ও বৃটিশ দূতাবাসে আল কায়েদার হুমকি কোনও নতুন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে বুঝে ওই দিনই ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং জাপানী দূতাবাসে আল কায়েদার হুমকি-বার্তা আসে। আর কায়দা-র সেই ছায়া দেখেই ঝাঁপ ফেলে দেয় ওই তিন দেশের ইয়ামেনীয় দূতাবাসগুলি!

আত্মবিস্মৃত

আত্মবিস্মৃত জাতি বলে বাঙালীর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। অদূর ভবিষ্যতে সেই খ্যাতিতে আমেদাবাদী গুজরাতীরা ভাগ বসাতে চাইলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ আমেদাবাদের জামনগর প্যালেস থেকে রঞ্জিত সিংহের মহামূল্যবান ব্যাটখানিই চুরি হয়ে গিয়েছে। ইনিই ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তী রঞ্জিত সিংহ যাঁর নামে আজও খেলা হয়ে থাকে রঞ্জি ট্রফি। আজকের দিনে ওই ঐতিহাসিক ব্যাটের মূল্য প্রায় চার কোটি টাকা। তবে হৃত ব্যাটটি পুনরুদ্ধারের আশা গুজরাতবাসী করতেই পারেন। কারণ আত্মবিস্মৃত বাঙালীর দুর্ভাগ্য তাদের বুদ্ধ দেব (ভট্টাচার্য) রয়েছে, নরেন্দ্র (মোদী) নেই!

শেষ বিচার

বিচার শুরু হলো কমিউনিষ্ট চীনের একনায়কোচিত শাসন ব্যবস্থার কট্টর সমালোচক লেখক ও অধ্যাপক লিউ জিয়াবাও'-এর। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন লিউ। আসলে লিউ বরাবরই গণতান্ত্রিক মতধারায় বিশ্বাসী। সেই কারণে সমাজতন্ত্রের নামে কমিউনিস্টরা চীনে যে একচেটিয়া শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে তার ঘোর বিরোধী জিয়াবাও। আর এতেই কমিউনিস্ট শাসকদের চক্ষুশূল হয়েছেন তিনি। ইতিপূর্বে '৮৯ সালে ২০ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন তিনি। এবার অপেক্ষা শেষ বিচারের।

পেট্রো-ডলারের মহিমা

আহা, পেট্রো-ডলারের কি অপরূপ মহিমা। পেন্টাগন কিংবা ওয়ার্ল্ডড ট্রেড সেন্টার আগেই গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন আরব জগতের এক খলিফা (পড়ুন ওসামা বিন লাদেন)। এবার ওই দুটির বিকল্প হিসাবে ২৬২৫ ফুটেরও বেশি ১৬০ তলা 'বুর্জ খলিফা' নামক গগনচুম্বী একটি বাড়ি তৈরি হয়েছে দুবাইতে। যা বিশ্বের উচ্চতম বাড়ির মর্যাদাও পাচ্ছে। যেখানে রয়েছে ১০৪৪টি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, বহু দফতর, হোটেল। এই 'বুর্জ খলিফা'র ৭৬ তলায় রয়েছে পৃথিবীর উচ্চতম স্যুইমিং পুল, আর ১৫৮ তলায় উচ্চতম মসজিদ। এটি বানাতে খরচ হয়েছে দেড়শো কোটি ডলার। সত্যি, পেট্রো-ডলারের মহিমা কি এত সহজে ভোলা যায়।

নয়া টোটকা

মমতার অস্ত্রেই মমতাকে ঘায়েল করা যে এবার বেশ কষ্টসাধ্য হবে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সিপিএম। সম্প্রতি হাওড়া জেলার আমতায় গিয়ে মমতা ব্যানার্জী বলেছেন রেলকে জমি দিলেই ক্ষতিপূরণ তো দেওয়া হবেই, উপরন্তু পরিবারপিছু একজনকে চাকরিও দেওয়া হবে। বাসুদেব আচারিয়া কিংবা মহম্মদ সেলিমের মতো সিপিএম সাংসদরা বরাবর বলে এসেছেন টানা রেললাইন করতে হলে মাঝপথে কোনও 'অনিচ্ছুক'-এর জমি পড়ে গেলে রেল আর গড়াবে না। অতঃকিম, কি করবেন মমতা? নিজের সিঙ্গুরীয় শক্তিশেলে নিজেই ঘায়েল হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখালেন না তিনি। বরং এমন একটা মোক্ষম চাল দিলেন যে রাজা (এক্ষেত্রে বুদ্ধ দেব) কিস্তিমাত না হয়ে যায়।

শৈত্যপ্রবাহ ও প্রতিবেদক

গত ৪ জানুয়ারি বীরভূমের শ্রীনিকেতনে আবহাওয়া দপ্তর তাপমাত্রার যে রিডিং নিয়েছিল তাতে সেদিনের তাপমাত্রা ধরা পড়েছিল ৭.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রী কম। আবহবিজ্ঞান অনুযায়ী এরই নাম শৈত্যপ্রবাহ। এই ঠেলার নাম যে বাবাজী তা বঙ্গবাসীর হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে টের পাইয়ে দিচ্ছে শীত। এটা শুনে এক সুহৃদের রসিকতা— বেশ আছো। যতদিন শীত চলবে, ততদিন তোমার মতো প্রতিবেদক একই গল্প লিখে নিউজপ্রিন্টের একাংশ ভরিয়ে দেবে। এমন সময় কে যেন টিটকিরি তান ধরল—কপালে সবার নাকি সুখ সয় না!

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শেষ সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন মাওবাদীদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে জুড়িয়া দিয়া লাগাতার প্রচার চালাইতেছেন, নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে চাহিতেছেন, সেই সময় পাল্টা বোমা ফাটাইলেন মাওবাদী নেতা কিষেণজী ওরফে কোটেশ্বর রাও। সম্প্রতি তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানাইয়াছেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার ও শরিক দলগুলির একাংশের সঙ্গে তাহার নিয়মিত যোগাযোগ রহিয়াছে। অন্যদিকে অভিযোগ হইল—পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে মাওবাদীদের কাজকর্ম, মাওবাদী নেতাদের খবরাখবর এবং সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনও সংবাদাদি জানিতেন না—এমন নয় নাই, বরং উপেক্ষা করিয়াছেন। এই অভিযোগ যে মিথ্যা নয় কিষেণজীর অভিযোগেই তাহা স্পষ্ট। তাই বলিতে হইবে ইহা ভণ্ডামির চূড়ান্ত। এমনকী ২০০৬ সালে খোদ রাজ্য সরকারেরই পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশ প্রশাসন মাওবাদী নেতা কিষেণজীর গতিবিধি, গোপন আড্ডা, সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশদ গোপন তথ্য জানাইয়াছিল, তাহার ভিত্তিতে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সুযোগ হাতছাড়া করিবার বিষয়টি বিস্ময়ের অপেক্ষা বরং ক্ষুব্ধ করে। বুদ্ধদেবের সরকার ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমতকে উপেক্ষা এবং কিষেনজী ও তাঁহার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করিতে ভয় পাইয়াছিল। বস্তুত, মাওবাদীদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য সম্প্রতি রাজ্য সরকারের যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে, দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহা লক্ষ্য করা যায় নাই। রাজ্য পুলিশের পক্ষ হইতে প্রায়ই জানানো হইত যে, মাওবাদীদের গতিবিধি জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশের অভাবেই তাহাদের গ্রেপ্তার করা যাইতেছে না। পুলিশ তাহাদের অসহায়তা প্রকাশ করিয়া আরও জানাইয়াছে, মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকজনদের স্পর্শ করিতে তাহারা সাহস করে না, কেননা ইহারা সিপিএম নেতাদের খুবই ঘনিষ্ঠ।

আর এই কারণেই কিষেণজী কলিকাতায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এখন তাহারা সরকারি সচিব পর্যায়ের পদাধিকারীদের সঙ্গে ফোনে কথা পর্যন্ত বলিতে পারেন, খনি অঞ্চল দূষিত হওয়া প্রসঙ্গে অভিযোগ করিয়া থাকেন। তাহারা প্রতিদিনই এখন বহু সাংবাদিকদের সঙ্গে সহজেই কথা বলিয়া থাকেন। আর এইসব ঘটনা যখন ঘটিতেছে রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রী তখন বলিতেছেন যে কিষেণজীকে গ্রেপ্তার করা বেশ শক্ত। মাওবাদী নেতাকে বছরের পর এই শহরে ঘুরাইয়া বেড়াইবার স্বাধীনতা দিয়া এখন তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার কঠিনতার কথা বলা হইতেছে।

মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে রাজ্য সরকার প্রথমদিকে তো কোনও লক্ষ্যই দেয় নাই, বরং তাহাদের প্রশ্রয় দিয়াছেন। বামফ্রন্টের একাংশের আদর্শগত ভ্রাতৃসম মাওবাদীদের দমন করিতে ফোর্স নিয়োগেও ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। আর সেই ঔদাসীন্যের কারণেই রাজ্য সরকার আজ মাওবাদীদের লইয়া দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। গত অক্টোবরে মাওবাদীদের শর্ত মানিয়া অপহৃত পুলিশ অফিসারকে যেভাবে উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা মাওবাদীদের কাছে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়।

অবস্থা যে কী দয়নীয় পরদিনই তাহা লক্ষ্য করা গিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ভট্টাচার্য হুমকি দিয়া বলিয়াছেন যে তিনি মাওবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করিবেন না। নকশাল দমন অভিযানে কেন্দ্র ও রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবে, রাজ্য সরকার প্রভাবিত এলাকায় একধারে বিদ্রোহ দমন এবং উন্নয়ন—এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করিবে। কৌশলগতভাবে পাঁচ ব্যাটেলিয়ান সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্সকে রাজ্য সরকারের তরফে পাঠানো হইয়াছে। নিরীহ মানুষের রক্ত লইয়া এই হোলি খেলা অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। বিদেশী শক্তির হাতে ক্রীড়নক নকশালপন্থীদের আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। ক্ষয়িষ্ণু আইন-শৃঙ্খলা থেকে রাজ্যকে মুক্ত করিবার ইহাই শেষ সুযোগ। কিষেণজীকে জঙ্গল হইতে টানিয়া বাহির করাই প্রথম কাজ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

সমগ্র ভারতীয় মনীষীবৃন্দ প্রাদেশিক ভাষাভেদ আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্য এবং রুচি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বৈরুপ্যকে দমিত করে, এক ভাষার সেবা করে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক একতার সভ্যতা প্রমাণিত করেছিলেন। সেই ভাষা সংস্কৃত ভাষা। বাঙালী নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতি রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায়। মহারাষ্ট্রীয়গণ ব্যাকরণ স্মৃতি মীমাংসা শাস্ত্রের নবীন শৈলীর উদ্ভাবন করেছিলেন এই ভাষার সাহায্যেই। এই ভাষাকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যগণ ভগবান শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধবাচার্য, বল্লভ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁদের দর্শন ও ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। নানা দেশের কবিগণ যখন সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণ ও আনন্দ বিধানের জন্য কাব্য রচনা করেন তখন এই ভাষাই তাঁদের উপজীব্য ছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন অপভ্রংশ প্রাকৃতের প্রচলন অব্যাহত রেখেও সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নত শিক্ষার বাহন ছিল এই এক সংস্কৃত ভাষা। কেবল ধর্মকার্যেই না, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মাধিকরণের বিচারব্যবস্থার এবং ক্রয়বিক্রয়, পণ্য ইত্যাদির সাধনও ছিল এই সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষার অনুশীলন করে এবং এই ভাষায় রচিত ঋষি ও আচার্যগণের প্রচারিত শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করে ভারতবর্ষ তার একাত্মতা ফিরে পেয়েছিল।

—ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ ঃ ভারতের ঐক্য সাধনার সূত্র।

মুম্বাই সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তান আজ নিজেই সন্ত্রস্ত

এন সি দে

মুম্বাইয়ে পাক-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের জঙ্গি হামলার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই প্রথম অতল আরব সাগর পেরিয়ে মাত্র ১০ জন জঙ্গি মহারাষ্ট্রের বাণিজ্যনগরী মুম্বাইয়ের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ জন-অধ্যুষিত জায়গায় হামলা করেছিল। শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিল হাজারেরও বেশি মানুষ। কিন্তু তারপর? তৎকালীন কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকার এই ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই ছিল লোকসভা নির্বাচন। সুতরাং লোকসভায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের মুখে ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গরম গরম বুলি। পাকিস্তানে আশ্রয় প্রাপ্ত সব জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছিল।

দাবী, পাল্টা দাবী; যুক্তি আর পাল্টা যুক্তি দিতে দিতে লোকসভা নির্বাচনী বৈতরণী সফলতার সঙ্গে পার হয়ে গেছে কংগ্রেস দল। তারপর থেকে সুর ক্রমশ নরম হতে হতে এই এক বছরে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। কাজের কাজ কিছুমাত্র হয়নি। পাকিস্তান যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ভারত যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রেও নির্বাচনী বৈতরণী সাফল্যের সঙ্গে পার হয়ে গেছে কংগ্রেস। বছর পূর্তির দিন সুদূর আমেরিকায় বসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন যে যতদিন না এই হত্যালীলাকারীদের সমুচিত শাস্তি হয় ততদিন তিনি ক্ষান্ত হবেন না। সেটা কতদিন তিনি অবশ্য বলেননি। তবে আগামী লোকসভা পর্যন্ত অবশ্যই তিনি রাজনৈতিক ভাবে ক্ষান্ত থাকবেন।

গোটা একটি বছর মুম্বাই হামলাকাণ্ড নিয়ে রাজনীতি করলো যে দল সেই দলেরই মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর ডানহাত প্রণব মুখোপাধ্যায় সংসদে বিরোধী নেতার ভাষণের মাঝে সব সময় বলে গেলেন, 'বিজেপি মুম্বাইকাণ্ড নিয়ে রাজনীতি করছে। এবং এর জন্য তাদের আরও মূল্য দিতে হবে।' অর্থাৎ বিজেপি লোকসভা ও অন্যান্য রাজ্যে যেমন নির্বাচনে হেরেছে, তেমনি মুম্বাই নিয়ে রাজনীতি করলেও তাদের আরও ভরাডুবি হবে। এটি বিজেপি'র প্রতি একটি চরম কটাক্ষ এবং নীরব হুমকি। এটা অবশ্যই বিস্ময়ের কথা যে কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি বিষয়ে চিরকালই রাজনীতি করে আসা সত্ত্বেও নির্বাচনে সফল হয় কী করে? এর ফলেই কংগ্রেস আজ অহঙ্কারী, হঠকারী হয়ে উঠছে।

এর কারণ লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। সনাতন ভারতবর্ষের মানুষের চিত্তে আবহমানকাল ধরে চিরজাগরুক হয়ে আছে সনাতনী ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতি। এই চিত্তে সংকীর্ণ গোষ্ঠী বা জাতি সত্ত্বা কখনও স্থান পায়নি। ধর্মীয় সত্ত্বাই চির প্রধান হয়ে থেকেছে। সেই কারণেই স্বামীজী বলেছিলেন, ধর্মই এদেশের মানুষের প্রাণ ভোমরা। এ রাক্ষসীর প্রাণ পাখীটি লুকানো আছে ধর্মে। এদেশের মানুষের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা নয়, পারমার্থিক স্বাধীনতা মুক্তি।—'লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ।'

এই দেশের সনাতনী সংস্কৃতির ধারক মানব গোষ্ঠীর এই জাতীয় চরিত্রই তাকে রাষ্ট্রবিমুখ করে রেখেছে। সেই কারণেই কোনও মুসলিম বা খৃস্টান প্রার্থীও হিন্দু এলাকায় দাঁড়িয়ে অকাতরেই হিন্দু ভোটেই জিতে যায় কোনও হিন্দু মন্দিরে গিয়ে সিঁদুরের টিপ পরে নিলেই। এই কারণেই ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দু জাতীয়তার কোনও মূল্যই কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকার দেয় না। যে জাতীয়তা চেতনার অভাবে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণকারী ইংরেজ সরকারের রাজকর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও হিউম হয়ে যায় আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরু। তিনিই গঠন করেন কংগ্রেস দল আমাদের স্বাধীনতালাভের স্বার্থে। সেই কংগ্রেসই হয়ে ওঠে ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার একমাত্র দল। সেই দলই আজও ভারতবর্ষের বৃহত্তম মানুষের আশীর্বাদ ধন্য। সেই দলের অন্তরাত্মা এখনও একজন বিদেশিনী। তিনি যে কোনও মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যেতে পারেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এমন একটি দল এখনও তৈরী হলো না যারা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাদের মাথায় এই সত্য ঢুকিয়ে দিতে পারে যে ধর্ম এদেশের প্রাণ ভোমরা হলেও তাকে রক্ষার জন্য নিজস্ব সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্যের হলেও এটা সত্যি যে বিজেপি সংসদে মুম্বাই কাণ্ডের মূল নায়ক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকার যে সমস্ত গরম গরম বুলি আউড়েছিল সে সম্পর্কে কি কি পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে তার জবাব চায়নি। চেয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জবাব। একজন বিদেশীর রাষ্ট্রপ্রধানের পদ দখল করার লড়াইকে শুধু নির্বাচনী ইস্যু করেছে। ইস্যুটিকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার গণ আন্দোলনে পরিণত করেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর জাতীয় আবেগকে সম্মান জানিয়ে অযোধ্যার রাম জন্মভূমি আন্দোলনের সুষ্ঠু পরিণতিকে গুরুত্ব না দিয়ে এটিকেও প্রতিবার নির্বাচনী ইস্যু করতে ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছে। জার্মানিকে খণ্ডিত করে তার বুকের উপরে যে দেওয়াল তুলে দিয়েছিল কমিউনিস্টরা, খণ্ডিত জার্মানির মানুষ সেই জাতীয় কলঙ্ক চিহ্নটিকে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই উপড়ে ফেলে দিয়েছেন। এনিয়ে কোনও বিতর্ক সে দেশের বুদ্ধি জীবীরা তুলতে সাহস পায়নি। কারণ সে দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো ইস্যুটিকে নির্বাচনী ইস্যু না করে লাগাতার রাষ্ট্রনৈতিক কলঙ্ক মোচনের আন্দোলনে পরিণত করেছিল। বিজেপি ক্ষমতা ভোগ বা দখল করাকেই গুরুত্ব দিয়েছিল; সমস্যার সমাধানকে নয়। যে চীন ভারতে কাশ্মীরে রাষ্ট্রবিরোধী মুসলমানদের কার্যকলাপকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বলে মদত দিচ্ছে, সেই চীনই আবার নিজের দেশের উইগুর মুসলিমদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্দোলনকে কঠোর ভাবে দমন করছে। এমনকী ৪ মাসের মধ্যে বিচার করে ৯ জনকে ফাঁসিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে হাতেনাতে ধরা পড়েও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ সত্ত্বেও আফজল গুরুর ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে না। কাসভ হাতেনাতে ধরা পড়ে এখনও রাজার হালে আছে। তার পিছনে ইতিমধ্যেই ৩১ কোটি টাকা সরকারের খরচ হয়ে গেছে।

পাকিস্তানি শাসকগণ জন্মলগ্ন থেকেই তার জনগণকে হিন্দুস্থান বিরোধী কার্যকলাপে ব্যাপৃত রেখে তাদের কাজ হাসিল করেছে। ক্রমেই এই ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় মদতপূর্ণ গোঁড়ামি পাকিস্তানের সমাজ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীকেও কলুষিত করেছে। পাকিস্তান শুরু থেকে কখনই চায়নি তাদের দেশকে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক আর্থিকভাবে শক্তিশালী আত্মনির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করতে; বরং চেয়েছিল গোঁড়া মুসলিম সন্ত্রাসবাদী তৈরীর স্বর্গে পরিণত করতে যেখান থেকে রপ্তানী হবে সারা বিশ্বে শুধুই ইসলামী সন্ত্রাসবাদী। সেদিন পাকিস্তান বুঝতে পারেনি সন্ত্রাসবাদ তৈরির ফলে শুধু সন্ত্রাসবাদীই তৈরি হয়; কোনও মহান আদর্শ তা থেকে পাওয়া যায় না। বরং ধীরে ধীরে সৃষ্টিই অনাসৃষ্টিকারীকে গ্রাস করে। আজ শাসককুলকে ঘিরে ফেলেছে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। শাসককুল মোল্লাতন্ত্রী জেহাদী নামক সন্ত্রাসবাদীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতকে দার-উল-ইসলাম (ইসলামভূমি)-এ পরিণত করতে যে অস্ত্র শাণিত করেছিল পকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শাসকবর্গ, সেই অস্ত্রই আজ পাক শাসকবর্গকে আক্রমণ করছে। গত দু-বছরে আড়াই হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে পাকিস্তানে। মার্কিন ও চীনের দেওয়া অর্থে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পাক শাসকরা আর এদের দেওয়া মারণাস্ত্রে শক্তিমান হয়ে উঠেছে মোল্লাতন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীরা। এরা ১০ই অক্টোবর '০৯-এ আক্রমণ করেছে পাক মিলিটারী এস্টাব্লিশমেন্টে, পরের দিনই আক্রমণ করেছে আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে, নিহত হয়েছে ১৯ জন। এইভাবে একের পর এক আক্রমণ হয়েছে ইসলামাবাদ, পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি, কোহাট ও লাহোরে গত অক্টোবর মাসের পর থেকে। পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সম্পর্কে ফাটল ক্রমশ বেড়ে চলেছে। টালমাটাল পাকিস্তান ও পাক সরকার ভাঙ্গনের মুখে।

কিন্তু সি.বি.আই-'র প্রাক্তন ডাইরেক্টর যোগীন্দার সিং পাকিস্তানের ভাঙ্গনে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন যে তালিবানদের উপর আমেরিকা ও পাক সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, দেশের আণবিক অস্ত্র ভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে পারে জেহাদীদের হাতে। সেটা মানবজাতির পক্ষে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এর ফলে শুধু তালিবানদের স্বর্গরাজ্য নয়, আমেরিকা, চীন ও পাকিস্তানে তাদের সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলবে। মুশারফের সাহায্য নিয়ে আমেরিকা আগেই ভারতের সীমান্তের একেবারেই কাছেই বিমান ঘাঁটির দখল নিয়েছে। আর জারদারির সাহায্য নিয়ে চীনও পাক বন্দরগুলির দখল নিতে শুরু করেছে। দুর্বল পাকিস্তান তাই ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করবেই।

পরলোকে মনোমোহন রায়

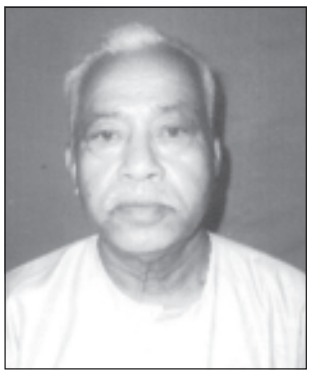

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর প্রবীণ প্রচারক মনোমোহন রায় আর নেই। গত ৫ জানুয়ারি শিলিগুড়ি সঙঘ কার্যালয় মাধব ভবনে ঘুমের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বৎসর। অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তিনি স্বদেশ ও হিন্দু সমাজের সেবায় নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে।

জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা গ্রামে তাঁর জন্ম। শিলিগুড়িতে তরুণ বয়সে তিনি সঙেঘর সংস্পর্শে এসে সঙেঘর প্রচারক হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেন। সঙেঘর জেলা ও বিভাগ প্রচারক হিসাবে দায়িত্ব এবং পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কর্মরত ছিলেন। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি-র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এছাড়া ভারতীয় মজদুর সঙঘ, সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতির দায়িত্বও পালন করেছেন। এরই পাশাপাশি তিনি জল্পেশ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-রও তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক।

বিস্ময়ের হলেও সত্য, একই দিনে কলকাতায় তাঁর ছোট ভাই কুঞ্জবিহারী রায় পরলোকগমন করেছেন।

কল্যাণ আশ্রমের তীরন্দাজীতে বাংলার মেয়েরা

সংবাদদাতা ঃ অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম আয়োজিত ১৪তম রাষ্ট্রীয় একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ৩০ ডিসেম্বর হিমাচল প্রদেশের শোলন শহরে 'টোডো ময়দানে' সমাপ্ত হল। সমারোপ অনুষ্ঠানে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমকুমার ধুমল উপস্থিত থেকে সমাপ্তি ভাষণ দেন। দক্ষিণ বঙ্গ প্রদেশ থেকে কল্যাণ আশ্রমের নির্বাচিত ২৫ জন ক্রীড়াবিদ ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, নির্দিষ্ট ১৩টি পদকের মধ্যে ২টি পদক জিতে নেয়।

তীরন্দাজীতে ব্যক্তিগত বিভাগে জুনিয়ার বালিকা বিভাগে ওই দুটি পদক পায় কুমারী শর্মিলা সোরেন (৩০ মিটার দূরত্ব, পূর্ব পুরুলিয়া জেলা) এবং কুমারী মালতী হাঁসদা (৪০ মিটার দূরত্ব, পশ্চিম পুরুলিয়া জেলা)।

ইডেনে বিদ্যুৎ বিভ্রাট

(১ পাতার পর)

যেহেতু ফ্লাডলাইটের প্রশ্ন নেই, এবং গন্ডোগোলটা আপাতত বিদ্যুৎ নিয়েই তাই কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সম্মানজনক একটা রফাই হয়তো হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সি এ বি যে একটি 'স্বশাসিত সংস্থা' এই তত্ত্বও 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত' হবে। এদিকে কোটলা পিচ কেলেঙ্কারীর পর আইসিসি-র কোপ থেকে রেহাই পেতে বিসিসিআই সব দায়ভার দিল্লী ক্রিকেট সংস্থার ওপরই চাপাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতেও ভবী ভুলছেনা দেখে প্রাক্তন আইসিসি প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়ারই শরণাপন্ন হতে চাইছে বিসিসিআই-এরই একাংশ। যে কারণে, ইডেনে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন উঠলেও তা নিয়ে কেন নিশ্চুপ ডালমিয়া— এ প্রশ্নের উত্তরে অরুণ মিত্রের বক্তব্য, ''তিনি আগে বিসিসিআই এবং আইসিসি-রও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সুতরাং কোথায় কখন মুখ খুলতে হবে সেটা ভালোভাবেই জানেন ডালমিয়া।'' আড়াই বছর আগের সঙ্গে এই সর্বভারতীয় 'পট পরিবর্তন'টা আঁচ করতে পেরেই রীতিমতো রক্ষণাত্মক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গৌতমমোহনের 'বাড়াবাড়ি'-টা কলকাতা পুলিশ কমিশনারেরই 'স্বতন্ত্র উদ্যোগ' বলে ঘনিষ্ঠমহলে দায় সেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং সম্মান বাঁচানোর একটা প্রয়াস রাজ্য সরকার ও সিএবি-দু'পক্ষের মধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ডালমিয়ার বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করে অরুণ মিত্রের বক্তব্য—"বিদ্যুৎ বিভ্রাট আগামীদিনে যাতে আর না ঘটে তার জন্য ভাবনা-চিন্তা চলছে। আমাদের একটা কমিটিও রয়েছে। কিছুদিন পরেই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা বলতে পারব।"

সি এ বি-র গোপন সূত্র বলছে—রাজ্য সরকার ও সিএবি দু'পক্ষই আগামী কয়েকদিন সম্মানজনক একটা রফাসূত্রের চেষ্টা চালাবে এবং তাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় আশ্চর্য হলেও সত্যি, দেখা যেতে পারে বিসিসিআই-কে।

পুনশ্চ ঃ শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী, সি এ বি-র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে চার সদস্যের তদন্তকারী প্যানেল গঠিত হয়েছে।

দণ্ডিত আসামী শিল্পমন্ত্রীর পদে

(১ পাতার পর)

রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা এতকাল নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। জানি না এবার করবেন কী না।

১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে সশস্ত্র সিপিএম কর্মী সমর্থকরা হামলা চালায়। তারা বাড়িতে ঢুকে প্রণব সাঁই ও মলয় সাঁই নামে দুই যুব কংগ্রেসীকে তাদের মায়ের চোখের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যার পর সন্তানের রক্ত আঁজলা-ভরে মায়ের মুখে মাখায় এবং জোর করে তাঁকে রক্তমাখা ভাত খেতে বাধ্য করে। প্রকাশ্য দিনের বেলায় পাড়া প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে এমন নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল। নানা টালবাহানার পর ১৯৭২ সালের শেষদিকে পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। আদালত ১৯৭৩ সালে আটজন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৯৭৫ সালে দু'দফায় তাদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে শাস্তি পুনর্বিবেচনার আপিল করা হলেও তা খারিজ হয়ে যায়। এরপর ১৯৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর গোটা মামলাই রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করে নেয়। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। বিচারাধীন মামলা সরকার চাইলে প্রত্যাহার করতে পারে। বিচার শেষে দণ্ডিত আসামীদের মামলা কীভাবে প্রত্যাহার করা যায় তা বোঝা যাচ্ছে না। যা করা যায় তা হলো সুপ্রীম কোর্টে মামলার পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করা। কিন্তু রাজ্য সরকার সে পথে হাঁটেনি। মহাকরণ থেকে সরকারি নির্দেশ জারি করে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের দণ্ডিত আসামীদের জেল থেকে মুক্ত করা হয়। এই কাজটা যে বেআইনি তা জানা ছিল বলেই মামলার সমস্ত নথিপত্র লোপাট করা হয়। যে আটজনকে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে পাঁচজন সিপিএম নেতা বর্তমানে পার্টি ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। এই পাঁচ নেতা হলেন নিরুপম সেন, বিনয় কোঙার, মানিক রায়, অমল হালদার এবং রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরুপমবাবু রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী। বিনয়বাবু সিপিএম পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। অমল হালদার পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং রজত বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদে বসে লাঠি ঘোরাচ্ছেন। রিজওয়ানুরের মৃত্যু নিয়ে সরব কলকাতার সংবাদমাধ্যম খুনের মামলায় দণ্ডিত আসামীর শিল্পমন্ত্রীর পদে বসে থাকাটা কীভাবে নেয় সেটাই এখন দেখার।

পদের দাবী

(১ পাতার পর)

সময় হয়েছে, সেসব বুঝে নেওয়ার। দলে মুসলমানদের আগে নেতা হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে। তারপর অন্যকিছু। সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব এতে বেশ আশঙ্কায় রয়েছে। ধর্মীয় ভিত্তিতে যদি একটি বামপন্থী পার্টিতে পদের দাবী ওঠে তাহলে দলের মূলেই কুঠারাঘাত বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু তাঁদের মত হল, এতদিন মুসলিমদের নানা অছিলায় তোষণ করাই হয়েছে। তোষণের দৈত্য এখন বোতল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তাকে সামলাবে কে?

গুজরাটে বিজেপির বিজয় অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিজেপি গুজরাটে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির নির্বাচনে জয়ের 'ধারা অব্যাহত রেখেছে। জেলা পঞ্চায়েতে ৪টি, মহকুমা পঞ্চায়েতে ১৭টি এবং নগর নিগমে উপনির্বাচনে ১৪টি—সব মিলিয়ে মোট ৩৫টি আসনে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেস পেয়েছে ২৫টি আসন। জেলা পঞ্চায়েতে ৫, মহকুমা পঞ্চায়েতে ১৪ এবং নগর নিগমে ৪টি আসনে কংগ্রেস পেয়েছে। রাজ্যের ৭টি বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি ৫টিতে জয়লাভ করেছে।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এমকে বাঁচাতে আল্লার শরণে রেজ্জাক

নিশাকর সোম

এই কলামে লেখা হয়েছিল— সি পি এম পার্টির মধ্যে প্লেনামের দাবী প্রবল হয়েছে। কিন্তু প্লেনাম ডাকার সাহস রাজ্য সি পি এম নেতৃত্বের নেই। তাই বর্ধিত রাজ্য কমিটির সভা অর্থাৎ রাজ্য কমিটির সদস্য ছাড়া প্রতিটি জেলার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ও গণসংগঠনের পার্টি নেতৃত্বকে নিয়ে সভা ডেকেছে। এই সভায় পেশ করার জন্য শুদ্ধি করণের যে দলিল পেশ করা হবে তা রচনার দায়িত্ব পড়েছে বর্ধমান লবির উঠতি নেতা মদন ঘোষের ওপর। তাঁকে মনিটরিং করছেন বিনয় কোঙার এবং নিরুপম সেন। এই সভাতে কিছুই হবে না। কারণ, যাঁরা উপস্থিত থাকবেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কমবেশী দোষে দুষ্ট। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিতে বেতনভুক সারাক্ষণের কর্মীরা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করতে সাহস পান না। কারণ যদি হোলটাইমারশিপ কাটা যায় তবে কি হবে? তাই 'দলদাস' হয়ে থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, সি পি আইয়ের রাজ্য নেতৃত্বও রাজ্য প্লেনামের প্রস্তাব বাতিল করে বলেছেন, আগামী বছরের প্রথমে পার্টি কংগ্রেস তো হচ্ছেই।

উল্লেখ করা প্রয়োজন সি পি এমের পলিটব্যুরোতে শুদ্ধি করণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, শুদ্ধি করণ পার্টির ওপরতলা থেকেই শুরু হবে। মাছের পচন মাথা থেকেই হয়। পলিটব্যুরোর সভার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ বাবু যদিও বলেছেন, নেতৃত্ব বদলের কোনও প্রস্তাব নেই। পলিটব্যুরোর শুদ্ধি করণের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দলিলটি জানুয়ারি মাসে কলকাতার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পেশ করা হবে। উল্লেখ করা যায়, সি পি এম-সিটু নেতা পলিটব্যুরো সদস্য ডঃ পান্ধে বলেছেন, নেতৃত্বের বদলের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাবও আছে। রেজ্জাক মোল্লার বক্তব্য, "ভেজালে পার্টি ভরে গেছে"—যা পলিটব্যুরোর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেনে নিয়েছেন।

এই রেজ্জাক সাহেব আবার বলেছেন, "চিকিৎসক যখন রোগীর আশা ত্যাগ করেন, তখন দোওয়া-দারুদ-এর প্রয়োজন। সি পি এমের বাকিটা আল্লার হাতে।" রেজ্জাক মোল্লা সুভাষ চক্রবর্তীর মতো বুদ্ধ দেবকে বিঁধে চলেছেন। সম্প্রতি মুসলিমদের একটি অ-রাজনৈতিক সংস্থা 'নয়া জমানা'-র সম্মেলন হজ হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। হজ হাউসটি সি পি এমের চিকিৎসা কেন্দ্র পি আর সি-র উল্টো দিকে অবস্থিত। এই সম্মেলনে রেজ্জাক বলেছেন, "মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ দরকার।" প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমরা সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি চাই। কোনও সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই।" এর জবাবে রেজ্জাক বলেছেন, "বি আর আম্বেদকর যে সংরক্ষণের কথা বলে গেছেন, কারুর বাপের সাধ্য নেই তা তুলে দেয়।" রেজ্জাক সাহেবের বক্তৃতাতে কি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? সি পি এমের ভোটব্যাঙ্ক মুসলিম ভোট শূন্য হওয়াতেই রেজ্জাক সাহেব মুসলিম তাস নিয়ে খেলছেন! অবশ্য সি পি এমের নীতি হলো, মুসলিম তোষণ করা। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক সি পি এম সদস্য বিরক্ত। শুধু বিজেপিকে মিথ্যা অপবাদ দিলে হবে না—সি পি এম রীতিমতো মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী তো নমাজ পড়া থেকে শুরু করে এবার তো মহরমের মিছিলে অংশগ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন তিনি কতটা মুসলিম ভক্ত।

রেজ্জাক সাহেব ওই সংগঠনের সম্মেলনেও তাঁর প্রথামাফিক বলেছেন, "কালো চুলের মেয়ে আর ছেলেরা এগিয়ে এলে তবেই ভালো হবে। আমি তো বুড়ো হাবড়া, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।"

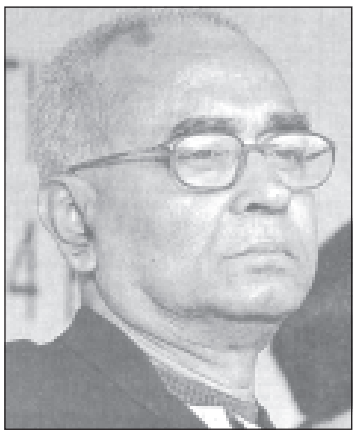

রেজ্জাক মোল্লা চুপ করবেন না, কারণ তিনি চান বুদ্ধ -বিমান-নিরুপম-বিনয়-শ্যামলদের অপসারণ। শোনা যাচ্ছে, তাঁর পেছনে পলিটব্যুরোর জনৈক সদস্যর মদত আছে!

আগেই লেখা হয়েছিল, ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে প্রো-সিপিএম এবং অ্যান্টি সি পি এম ব্লকের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে। ঠিক একই ভাবে আর এস পি-র শিক্ষক সংগঠনে বলা হয়, সি পি এমের বিরোধিতা ত্যাগ করতে হবে। বস্তুত, বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সি পি এমের দিকে এগিয়ে আসবে। তবে যাই হোকনা কেন, ২০১০ সালে যতই চেষ্টা হোক না, সকল চেষ্টাকে বিফল করে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের ফিরে আসা অসম্ভব।

এখন চারটি বামপন্থী দল— সি পি এম, সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক-এর কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা হবে, এবং বাম ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য আলোচনা হবে। অপরদিকে নয়াদিল্লীতে বুদ্ধ বাবু, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে 'পার্লে' বৈঠক করেছিলেন। তাতে বুদ্ধ বাবু আশ্বস্ত হতে পারেননি, তিনি হালে পানি পাননি।

> **রেজ্জক মোল্লা চুপ করবেন না, কারণ তিনি চান বুদ্ধ -বিমান-নিরুপম-বিনয়-শ্যামলদের**

পক্ষান্তরে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটে দ্বন্দ্ব উপস্থিত। বাস্তবিকভাবে বলা যায়, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নিচের তলার কর্মীরা ধীরে ধীরে তৃণমূলে যাচ্ছেন। কারণ, ২০১১ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় তৃণমূল আসবেই। কাজেই এখন থেকেই লাইন দেওয়াটাই বুদ্ধি মানের কাজ।

বর্তমানে রাজ্য কংগ্রেস অভিভাবকহীন, অনাথ। প্রণব মুখার্জী সভাপতি—কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় কাজে ব্যস্ত। প্রদীপ ভট্টাচার্য নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও একটা বড় পদের প্রত্যাশী। সুব্রত মুখার্জী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনেই বেশী সময় দেন। কারণ, এর ফলে তাঁর বিদেশে ঘোরা সুনিশ্চিত থাকে। অধীর চৌধুরী মুর্শিদাবাদ-নবাব হয়ে বসে আছেন, দীপা দাশমুন্সি প্রিয়বাবুর তৈরি বাগানের মালী হয়েছেন। ফলে কংগ্রেস-তনু ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতম হয়ে যাচ্ছে। এর কারণেই তৃণমূল নেত্রী ছোড়দাকে (সোমেন মিত্র) রাজ্য কংগ্রেসকে ধীরে ধীরে ভাঙার কাজে লাগিয়েছেন। ছোড়দা নিজের অবস্থা বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। এখন পুর-নির্বাচনের কর্তা হয়েছেন। কাজেই মনোনয়নের জন্য অনেকেরই কংগ্রেস তৃণমূলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। ক্ষমতা অতি বিষম মিষ্টি বস্তু।

তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেস ভেঙে দেবার যে ছক কষেছেন, তাতে হয়ত কিছু সাফল্য এলেও আসতে পারে। কিন্তু তৃণমূলের অভ্যন্তরে মতদ্বৈধতার চোরাস্রোত দেখা যাচ্ছে। শোভনদেব চ্যাটার্জী কোণঠাসা এবং মদন মিত্র ক্ষমতাচ্যুত। পার্থ চ্যাটার্জী বলেছেন, "মমতা ব্যানার্জী যেখানে অবস্থান করেছেন সেটা তীর্থক্ষেত্র।" অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জীকে দেবীতে পরিণত করা হয়েছে। এক সময় কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি ডঃ দেবকান্ত বড়ুয়া বলেছিলেন, "ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া"।

দেবকান্ত রাজনৈতিক অবলুপ্তিতে চলে গেছেন। ব্যক্তিকে ভজনা করার ফলে সেই ব্যক্তি ম্যাগনোমেলিয়ায় আক্রান্ত হন। যেমন বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। ফলে তিনি অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছেন।

অন্য রকম

পাইলট মনু-সংহিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ফ্লাইট লেফট্যানান্ট মনু আখৌরির ছেলেবেলায় একমেবা-দ্বিতীয়ম খেলনা-বাটি ছিল প্লেন, মানে উড়োজাহাজ। এর দোসর ছিল হেলিকপ্টার। আকাশে যখন প্লেনগুলো উড়ে যেত, হাঁ করে চেয়ে থাকত ছেলেটি। ছেলের অমন হাব-ভাবেই বাবা-মায়ের মালুম হলো, এই ছেলে বড় হয়ে পাইলট না হয়ে যায় না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। মনু-র বাবা কর্ণেল সঞ্জয় আখৌরি এবং তাঁর পত্নীও যা ভেবেছিলেন তাই হলো বটে ছেলে, কিন্তু জীবন যেমন দেয় অনেক তেমনি ফিরিয়েও নেয়। ভাগ্যদেবতা ফিরিয়ে নিলেন মনুকে। গত বছরই ১০ই সেপ্টেম্বর মিগ-২১ বিমানের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন মনু আখৌরি। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে

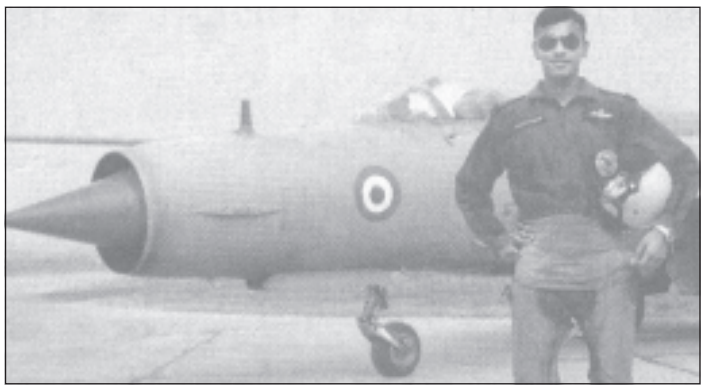

মনু আখৌরি

গভর্নমেন্ট সিনিওর সেকেন্ডারী স্কুলের ভবনটাকে বাঁচাতে নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলেছিলেন তিনি। সেই বিপদ থেকে আর উদ্ধার করতে পারেননি আপনাকে।

কিন্তু নিজেকে যদি নিরাপদে রাখতে চাইতেন মনু, তাহলে কি অবস্থা হোত চন্ডীগড়ের গিদ্দারবাহ-এর ভিজিয়ানা গ্রামের ওই স্কুলটির? ভাবলে এখন বুক কাঁপে স্কুলটির অধ্যক্ষ শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবকদের পর্যন্ত। কারণ তখন পুরোদমে ক্লাস চলছিল স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রীরাও সাধারণ দিনের মতোই উপস্থিত ছিল। মিগ-২১ পেন্টাগণ স্টাইলে স্কুল ভবনে ধাক্কা খেলে সবশুদ্ধ মৃতের সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে ঠেকত তা কেউই ভাবতে পারছে না (কিংবা চাইছে না)। কিন্তু যার ছেলে গেল, তার সান্ত্বনাটা কোথায়? কি নিয়ে থাকবেন সারাজীবন? যে ছেলেকে আজন্মলালিত এই বিশ্বাসে বড় করেছেন যে, 'আমার ছেলে বড় হয়ে পাইলট হবে, মানুষের মতন মানুষ হবে, হয়তো বা সংসারীও হবে'—এর কি হবে? ছেলে হয়তো 'মানুষ' হয়েছে, কিন্তু এর মূল্য চোকাতে ক'জন বাবা-মা প্রস্তুত?

এখানেই হয়তো 'অন্যরকম' নামক নিয়মিত কলামে এই প্রতিবেদনটি সমাপ্ত হয়ে যেত পারত। কিন্তু এতক্ষণ যে মধ্যবিত্ত অভিভাবক সুলভ মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছিল, তার থেকে পুরোটাই অন্যরকম মনু-জনক সঞ্জয়। সেই কারণেই এই প্রতিবেদনটি আরও কিছুদূর অগ্রসর করার প্রয়োজন রয়েছে। অন্তত একটা অন্যরকম থেকে অন্যরকমের অন্যরকমে যেতে হলে এই অগ্রসরমানতার প্রয়োজন রয়েছে বইকী।

সঞ্জয় আখৌরি ঠিক করেছেন মনু যে স্কুলটিকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে প্রাণ দিয়েছেন অর্থাৎ চন্ডীগড়ের গভর্নমেন্ট সিনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুল-কে সাহায্যের অকৃপণ হাত বাড়িয়ে দেবেন তিনি। যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ওই বিদ্যালয়ের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ১০,০০০ টাকা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। ছেলের স্মৃতি রক্ষায় এর চাইতে ভাল সৌধ আর কিইবা হতে পারে? তাই লেখার কনক্লুশানে এসে গুলিয়ে যাচ্ছে, আসল 'অন্যরকম'টা কে? মনু আখৌরি না তার বাবা সঞ্জয় আখৌরি? প্রতিবেদকের দায়িত্ব 'সংহিতা' খানা প্রকাশ করা। বিচারের ভার তো পাঠকের।

শেখ হাসিনার ভারত সফর

বাংলাদেশের বিরোধিতা কমবে কিনা সময়ই বলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। যদি বিশেষ কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে আগামী ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে আসছেন। কেননা ইতিমধ্যে একবার এই সফরের তারিখ পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর আসার কথা ছিল গতবছর ডিসেম্বর মাসেই। দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর এটাই তাঁর প্রথম ভারত সফর।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে দুই প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে সফর চলাকালীন বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং চুক্তিও হয়তো স্বাক্ষরিত হবে। তবে শেষমেষ ভারতের প্রাপ্তির ভাঁড়ার কতটা ভরবে সেটাই দেখার। কেননা অভিজ্ঞতা খুব সুখের নয়। একটি মাত্র আশার কথা—দ্বিপাক্ষিক 'বন্দী-প্রত্যর্পণ চুক্তি' স্বাক্ষর এবং কার্যকরী করা।

যে কোনও সচেতন ভারতবাসী মাত্রই জানেন, প্রাক্-পূর্ব পাকিস্তান এবং অধুনা ৩৫ বছর বয়স্ক বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে শুধুই শিরঃপীড়া এবং যন্ত্রণাদায়ক। প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কম্যাণ্ড নমঃ নমঃ করে পালন করে থাকে। সিভিলিয়ানদের পক্ষে তার কোনও স্বার্থকতা, সংযোগই থাকে না বললেই হয়। আর ডান-বাম নির্বিশেষে রাজনীতির কুশল পেশাদারী খেলোয়াড়রা তাতে কোনওরকম উৎসাহ দেখান বলে মনে হয় না। সামান্যমাত্র ব্যতিক্রম প্রাক্তন সৈনিকদের এক ব্যতিক্রমী সংগঠন 'পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ।' যারা প্রতিবছর 'বিজয় দিবস' পালন করেন। সেদিন ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী ভারতের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিল। আর তা করতে ১৬ হাজার ভারতীয় সৈনিককে জীবন বলিদান দিতে হয়েছিল। শুধু কী তাই—বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধারা কাদের জোরে সুশিক্ষিত ও আমেরিকান অস্ত্রে সজ্জিত সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাফল্য পেয়েছিল? এক কোটি বাংলাদেশী (পূর্ব পাকিস্তানী)-কে এক বছর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে পুষেছিল ভারত। কথা রাখেনি বাংলাদেশ। ঋণ শোধ করেনি বাংলাদেশ। এমনকী কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেও রাজী নয় তারা।১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালো রাতে আপন সেনাবাহিনীর হাতে সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তারপর শুধুই ভারত বিরোধিতা। একের পর এক ক্ষমতায় আসেন—খন্দকার মুস্তাক আহমেদ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, হুসেন মহম্মদ এরশাদ (জন্মস্থান কুচবিহার) এবং বেগম খালেদা জিয়া এবং পাঁচবছরের জন্য মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ।

খালেদা।

মনমোহন

হাসিনা

এদের রাজত্বকালে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে ভারত-বিরোধিতার প্রমুখ কেন্দ্র। বাংলাদেশ থেকে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে ঠেলে ভারতে পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশী মুসলমানদের। বাংলাদেশের হিন্দীভাষী মুসলমানরা তো 'লং মার্চ টু ভারত' ঘোষণা করে শর্ট মার্চে ভারতে ঢুকে পড়েছে। অবশ্য একতরফা বাংলাদেশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বাংলাদেশ সন্নিহিত ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওই অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ভারতে নাগরিক বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সদা তৎপর। আজ বাংলাদেশী মুসলমানরা দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, জয়পুরের মতো দূরতম শহরেও ঘাঁটি গেড়ে স্থায়ী হয়ে বসে রয়েছে। বাংলাদেশী মোহাজির মুসলমানরা তো বামফ্রন্টের আমলে কলকাতার ব্যস্ততম ধর্মতলা-তে মিছিল করে ভারতের নাগরিকত্ব দাবী করেছিল। বিদেশী মুসলমানদের অন্য এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে "আমরা আছি, আমাদের নাগরিকত্ব দাও" একথা বলার সাহস যোগায় কারা—কোন দল, কোন দলের সরকার কোন দলের পরিচালিত পুলিশ প্রশাসন? দলদাস পুলিশ-প্রশাসন আজ এমন অকার্যকর, অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে যে তারা মুষ্টিমেয় মাওবাদীদের মাত্র একটি জেলাতেও মোকাবিলা করতে ব্যর্থ। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করছেন—একজন মাওবাদী যাঁর সচিবদের সঙ্গে ফোনে বার্তালাপ করছেন তাকে ধরতে যৌথবাহিনী নামিয়েও সমর্থ হয়নি পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন।

আগে থেকে যেটুকু আঁচ করা সম্ভব হয়েছে তা হলো—শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন প্রতিপালন করার পর কয়েকজন শীর্ষ আলফা নেতাদের কায়দা করে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিনিময়ে ভারত কিছু আর্থিক প্যাকেজ বাংলাদেশকে দেবে এটা অঘোষিত সংবাদ। দ্বিতীয়ত, অন্য এক শীর্ষ উলফা নেতা, অনুপ চেতিয়া বাংলাদেশে ধরা পড়ে জেল খাটার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর না ভারতে ফিরেছে না ধরা পড়েছে। বরং বহাল তবিয়তে রয়েছে সে বাংলাদেশে;সুদীর্ঘকাল বাংলাদেশ ভারতে সক্রিয় বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগ্রামরত গোষ্ঠীদের সবরকম সাহায্য করেছে। হাসিনার আমলেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

আর একটি কঠিন বাস্তব হল—ভারতে মুসলমানসংখ্যা চড় চড় করে বাড়লেও বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যা দ্রুত কমেছে এবং অনুপ্রবেশের কারণে ভারত লাগোয়া বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার মুসলিম জনসংখ্যাও দারুণ হ্রাস পেয়েছে। হিন্দু জনসংখ্যা কমার কারণ হিন্দু মা-বোনেদের উপর বাংলাদেশী মুসলমানদের অমানুষিক, বর্বর, মধ্যযুগীয় অত্যাচার। হাসিনা এর কতটা সমাধান করতে পারবেন? আদৌ কি তিনি আগ্রহী। বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় গ্রামবাসীরা বাংলাদেশের বি ডি আর এবং বাংলাদেশী ডাকাতদের অত্যাচারে সীমান্ত ছেড়ে পালিয়ে আসছেন। এসব বিষয় বন্ধ করা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কথা উঠবে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের। হাসিনাকে এবার ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। যে বাংলাদেশে হাসিনা নিজেই সন্ত্রাসের শিকার, যে বাংলাদেশ ভারতে নিয়মিত জাল নোট, জেহাদী-জঙ্গি, হাজার লাখ নয় কোটিতে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে ভারতকে ধ্বংসের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছে তাকে আদিখ্যেতা দেখানোতে কতটা ফল পাওয়া যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মাফিয়াদের গ্রাসে গুয়াহাটির জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সরকারি জমি দখল করে গুয়াহাটিতে গজিয়ে উঠছে ঝাঁ-চকচক করা পেল্লাই আকারের বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। অন্যদিকে রাজ্য সরকার নিজের কর্মচারীদের জন্য আবাসন গড়তে হিমসিম খাচ্ছে। একদল মাটি-মাফিয়া অসাধু সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজস করে হাতিয়ে নিয়েছে ওই সরকারি খাস জমি।

এই যোগসাজসের ব্যাপারটা গত ২২ ডিসেম্বর স্বীকার করে নিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ স্বয়ং। তারও কয়েকদিন আগে রাজ্যের ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী ভূমিধর বর্মন স্বয়ং রাজ্য বিধানসভায় সখেদে ব্যক্ত করেছেন, প্রচলিত আইন-কানুন ভূমি রক্ষা করতে যথেষ্ট সক্ষম নয়। তিনি সেজন্য মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের অনুকরণে অসমেও আইন প্রণয়ন করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

গত ২২ ডিসেম্বর দিসপুর চারিয়ালিতে (চৌরস্তা) দিসপুর সার্কেল অফিসের বিশাল ভবন নির্মাণের শিলান্যাস-এর পর ভূ-মাফিয়া বিষয়ে এই মন্তব্য করেন তরুণ গগৈ। তিনি জানান, তাঁর কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে। তার মধ্যে মাটি-মাফিয়া-আমলা যোগাযোগের বিষয়েও অভিযোগ এসেছে। শহরের উপত্যকা এলাকায় নতুন করে জবরদখল হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে শ্রী গগৈ জানান।

সূত্রমতে, কেবলমাত্র গুয়াহাটি শহরেই জবরদখলকৃত জমির পরিমাণ ৩০০০ বিঘারও বেশি। সরকারি কর্মীদের জন্য আবাসন তৈরি করতে সরকার যে বাইপাস সংলগ্ন এলাকার জমি নির্দিষ্ট করেছে সেটাও জবরদখল হয়ে রয়েছে। একথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। দিসপুর সার্কেল অফিস ১৯৮৭ সাল থেকেই ভাড়াবাড়িতে রয়েছে। প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণে সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে ৬৬.৪৯ কোটি টাকা।

যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেত পেয়ে পরদিনই জবরদখল মুক্ত করতে সরকারি বাহিনী আদাজল খেয়ে আসরে নামে। হঠাৎই সক্রিয় হয় কামরূপ জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, গুয়াহাটি কামরূপ জেলাতেই। বীরবিক্রমে লড়ালড়ি করে মাত্র ৩১ বিঘা জমি জবরদখল মুক্ত করতে পেরেছে। শ্রীগগৈ সংবাদমাধ্যমের কাছে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে একইরকম জবরদখলের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। বাকী জমির কী হবে তা এখন বলা সম্ভব নয়। কেননা দখলদারদের রয়েছে উচ্চ ক্ষমতা ও প্রভাব। তারা পর্দার আড়ালেই থেকে যায়।

একদিনের সক্রিয়তায় ৩১ বিঘা জমি উদ্ধার হয়েছে। হানা দেওয়া হয়েছিল দিসপুর রাজস্ব সার্কেলের বেলতলা মৌজার দাগ নং ১৮৪৭ এবং ১৩৩৫-এ। জায়গাটা এক্সপ্রেস হাইওয়ের লাগোয়া। ওই উদ্ধারকৃত জায়গাটাও সরকারি ভবনের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। তবে আর কত পরিমাণ সরকারি জমি দখলমুক্ত হবে তা জানতে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। খোদ রাজধানীতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অন্যান্য জেলা ও মহকুমার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য যে, ব্যাপকহারে বাংলাদেশীরাও সরকারি জায়গায় স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। তাদের রাজনৈতিক দাদাও রয়েছে। সেজন্য দখলদার উচ্ছেদ বাস্তবে কতটা এগোবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

এছাড়া অন্য একটা লক্ষণীয় হলো—গুয়াহাটিতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার ঢালাও বাড়বাড়ন্ত। সেখানে একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের তোলাবাজির ব্যাপক টাকা লগ্নী হয়েছে। ভয় অথবা ভক্তিতে সেটা সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষকে মেনে নিতে হচ্ছে এরকমই জনশ্রুতি।

নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভোটপর্ব সমাপ্ত হয়েছিল আগেই। ফল প্রকাশের পালা সাঙ্গ হতেই কিঞ্চিৎ টালবাহানা এবং অবশেষে বিজেপি-র সমর্থনে শিবু সোরেনের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন। চুম্বকে ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক চালচিত্রটা এখন ঠিক এমনই। কিন্তু এরপরে ঝাড়খণ্ড জুড়ে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করবে কিনা কিংবা করলেও সেই শান্তি দিল্লীর পার্লামেন্ট হাউসের আদৌ সহ্য হবে কিনা তা সময়ই বলবে। সময়ের ওপর এই ভরসাটুকু রেখে ঝাড়খণ্ডবাসীর আস্থা আপাতত দায়িত্ববোধসম্পন্ন দুই রাজনৈতিক পক্ষের ওপরই। যার একপক্ষ ভারতীয় জনতাপার্টি, অপরপক্ষ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা।

শপথ নেওয়ার পরে দুই মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং এবং রমেশ পোখরিয়ালের সঙ্গে শিবু সোরেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারী—এ দুটো বিষয় হলো একেবারে যাকে বলে 'স্ট্যান্ডিং ম্যাটার'। এছাড়াও এখন তেলেঙ্গানা পরবর্তী পরিস্থিতিতে 'ছোট রাজ্যের উপযোগিতা' শীর্ষক বিষয়টিও পাঁচ পাবলিক খাচ্ছে ভালোই! একদা বিহার ভেঙ্গে গঠিত হওয়া ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্বাচন সেই বিতর্কে যে নতুন করে অনভিপ্রেত ইন্ধন যুগিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিজেপির উদ্যোগে নবগঠিত সেই রাজ্যের মানুষ ২০০৪ সালের তাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দেয় বিজেপির ভোট বাক্সে। ইতিপূর্বে ২০০০ সাল নাগাদ তৈরি হওয়া ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা আগেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। কারণ ঝাড়খণ্ড গঠনের সময় বিজেপি-র সঙ্গেই আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা শিবু সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা নতুন রাজ্য গঠনের যাবতীয় কৃতিত্ব নিজের দিকেই টানতে চাইছিল। যার ফলে নবগঠিত রাজ্যের প্রথম জীবনটা মূলত কখনও বিজেপি-র বাবুলাল মারান্ডি, কখনও জে এম এম-এর শিবু সোরেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বেই অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু ২০০৪-এ ঝাড়খণ্ড বিধানসভার নির্বাচনে সেখানকার জনগণ পুরোপুরি বিজেপি-র প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করায় (জোটসঙ্গীদের নিয়ে ৮১ আসনবিশিষ্ট ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় বিজেপি জিতেছিল ৩৬টি আসন) রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা আসে রাজ্যে। অন্যদিকে ওই বছরই কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকার প্রথমবারের জন্য ক্ষমতায় এলে মন্ত্রী হন শিবু সোরেন। তখন রাজ্যে তাঁর দলের বিধায়ক সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭। এরপর দুর্নীতির অভিযোগে মন্ত্রীত্ব যায় তাঁর। পরে সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হলেও সোনিয়া-মনমোহন তাঁকে আর মন্ত্রীত্বে ফিরতে দেয়নি। এর পেছনে কংগ্রেসের অন্য একটা অঙ্ক খেলা করছিল। কংগ্রেস জানত, শিবু সোরেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ একনাগাড়ে হয়ে যেতে থাকলে, জনজাতিদের ওপর সোরেনের একছত্র আধিপত্য কিছুটা হলেও কমবে। অন্যদিকে এই দুর্নীতি-কে কংগ্রেস তো প্রশ্রয় দিচ্ছেই না উপরন্তু বরদাস্তও যে করছে না তা বোঝানোর জন্য শিবু-কে পাত্তা না দেওয়ার পন্থাই (যেমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁকে প্রত্যাবর্তন না করানো বা তাঁর সঙ্গে প্রাক-নির্বাচনী কোনও সমঝোতা না করা) নিয়েছিলেন সোনিয়া। আর এই কংগ্রেসী কূটনীতিতে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিল ঝাড়খণ্ডের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। অসম্ভব রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর জনজাতিদের 'গুরু' হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার ব্যাকুলতায় প্রথমে বিজেপি ছেড়ে ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা গড়লেন, পরে এবারে প্রাক্ -নির্বাচনী সমঝোতায় গেলেন কংগ্রেসের সঙ্গে। এদিকে বিগত বছরগুলোতে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা রাজ্যের জন্য প্রভূত উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ নিলেও প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট (অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সী ফ্যাক্টর) তাঁর বিরুদ্ধে যাবার একটা আশঙ্কা ছিলই। অন্যদিকে কংগ্রেসী শিবুবিরোধী প্রচার তাদের ভোটব্যাঙ্ককে যে আগের তুলনায় বেশ খানিকটা শক্তিশালী করতে পেরেছে তা বলাই বাহুল্য। ভোটের ফলেও এই জিনিসগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। ২০০৪-এর নিরীখে ৯ থেকে আসনসংখ্যা বেড়ে ১৩ হয়েছে কংগ্রেসের। আবার অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সী-র দরুণ বিজেপির ওপর জোট সঙ্গীদের আসন সংখ্যাও ৩৬ থেকে নেমে ২০-তে গিয়ে ঠেকেছে। বিশেষ হেরফের হয়নি শিবুর পার্টি জে এম এম-র। তাদের আগে ১৭ ছিল, এখন ১৮ হয়েছে।

কিন্তু তাদের নবগঠিত ঝাড়খণ্ড সরকারে শিবু সোরেনকে আর শুধুমাত্র মূল চালিকাশক্তিই বলা যাবে না, শিবু-র নিজের ভাষাতেই, 'আমি কিং মেকার নই, আমি কিং'। কিন্তু সামগ্রিক দায়িত্বটা বর্তাচ্ছে বিজেপি-র কাঁধেই। একটা বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্বের প্রশংসা করতেই হয়। তাঁরা ইচ্ছে করলেই বিরোধী আসনে বসতে পারতেন। সেক্ষেত্রে দায়িত্ব থেকে অনায়াসেই অব্যাহতি পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁরা সেটা না করে এমন একজনকে সমর্থনের দায়িত্ব নিয়েছেন যাঁর বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, শুধু তাই নয়, তিনি গত দু'দশকে কংগ্রেস-বিজেপি উভয়ের সঙ্গেই ঘর করেছেন। কিন্তু যে রাজ্য সৃষ্টির পেছনে বিজেপি-র অবদান সর্বোত্তম, আজ কংগ্রেসী কূট-চক্রের বিভেদকামীতায় আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা ভালোই করেছেন। বিশেষ করে এই টানাটানির বাজারেও যেখানে ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাঁরাই। কিন্তু আগামী বছরগুলোতে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে বিজেপি-কে। কারণ কংগ্রেস একবার খোঁচাটা খেয়েছে। তারা প্রত্যাঘাতের চেষ্টা করবেই। হয় ঝাড়খণ্ডে শিবু-কে, নয়তো বিজেপি-কে সংসদে।

এই নিদারুণ চ্যালেঞ্জ বিজেপি কিভাবে সামলায়, তার ওপরই নির্ভর করছে ঝাড়খণ্ডের ভবিষ্যত।

ছত্তিশগড়ে জনজাতি এলাকায় শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ছত্তিশগড়ের বাস্তার এবং সরগুজা এলাকায় সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে বিজেপি সংশয়াতীত প্রাধান্য নিয়ে জয়লাভ করেছে। এই দুটো এলাকাই জনজাতি অধ্যুষিত। সব মিলিয়ে ৯টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের মধ্যে ৬টিতে, ২৬টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মধ্যে ১২টি এবং ১১৯টি নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫৩টিতে জয়লাভ করেছে বিজেপি। চিরমিরি এবং রায়গড়— এই দু' জায়গাতেই কংগ্রেসের মেয়র পদ প্রার্থী পর্যুদস্ত হয়েছে বিজেপির কাছে। তবে ভোটের সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হলো যে, বাস্তার এলাকায় জগদ্দলপুর পৌর সংস্থার নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কিরণ দেবের বাইশ হাজারেরও বেশী ভোটে জয়। আবার রাজ্যের উত্তরে জনজাতি এলাকা সরগুজাতে বিজেপির বর্তমান মেয়র প্রবোধ মিঞ্জ বিপুল ব্যবধনের জিতে পরপর দ্বিতীয়বারের জন্য মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হলেন। তবে কংগ্রেসের সবচেয়ে করুণ অবস্থা দুর্গ অঞ্চলে। সেখানে বিজেপি প্রার্থী শিব কুমার তামের শুধু মেয়র পদে জয়লাভই করেননি, উপরন্তু বিরোধী কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রধান বিরোধীর পদ থেকে সরিয়ে সামগ্রিকভাবে একেবারে তৃতীয় স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে ছত্তিশগড় স্বাভিমান মঞ্চ দখল করে নিয়েছে মুখ্য বিরোধীর পদটি। এছাড়া কোরবা এবং দন্তুবিহারেও মেয়রপদে জয়ী হয়েছে বিজেপি।

তবে এই জয়জয়কারের মধ্যেও বিজেপির কপালে ভাঁজ ফেলতে পারে রায়পুর, বিলাসপুর এবং রাজনন্দনগাঁও পৌরসংস্থার ভোট। এই তিনটেতেই হেরেছে বিজেপি। জিতেছে কংগ্রেস। এর পাশাপাশি পৌর এলাকার আরও ৪১টি সামাজিক সংস্থার নির্বাচনেও কিন্তু জয়লাভ করেছে কংগ্রেস। তবে সব মিলিয়ে ছত্তিশগড়ে সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেসকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় যে কয়েক যোজন পেছনে ফেলে দিয়েছে তা না বললেও চলে।

নীলাচল পথে শ্রীচৈতন্য

ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

শ্রীচৈতন্যদেব, আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে নীলাচল যাত্রাপথে আদিগঙ্গাতীরে ছত্রভোগ বন্দর-তীর্থের কয়েক ক্রোশ উত্তরে আটিসারা গ্রামে পদার্পণ করেন। সেই আটিসারাই বর্তমানে বারুইপুর। তুর্কি আগ্রাসনের অন্ধকার লগ্নে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে জাতির পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ভাষায় সে জাগরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশার (Renaissance) চেয়ে বেশি খাঁটি। সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা তাঁর ভারতব্যাপী পথ পরিক্রমায় (১৫১০-১৫১৫) জাগ্রত হয়েছিল। পুরীর পথে দক্ষিণ ২৪ পরগণার আটিসারায় (বারুইপুর) পদার্পণ করেন পনেরো শ' দশ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (৯১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ ফাল্গুন)। সময়টা ভারত ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল। তুর্কি মুসলমানরা তখন দিল্লীর মসনদে। মোগলেরা হানা দিচ্ছে হিমাচলের গিরিপথ দিয়ে। মঠ, মন্দির বিচূর্ণ। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি এশিয়াবিখ্যাত-বিদ্যাকেন্দ্রগুলি ভস্মীভূত।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ দক্ষিণ-ভারতে বিজয়নগরে তখনও উড়ছে স্বাধীনতার পতাকা (১৩৩৬-১৫৬৫)। গৌড়বঙ্গে হাবসী সুলতানদের নারকীয় অত্যাচার অন্তে পাঠান হুশেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের চলেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। পঞ্চ দশ শতাব্দীর শেষে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে কালিকট বন্দরে জাহাজ থেকে নেমেছিল পর্তুগীজ নাবিক ভাস্‌কো-ডি-গামা ১৪৯৮ সালের ২৭ মে। কালিকটের হিন্দু রাজা জামোরিন সাদরে এই পর্তুগীজদের বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিলেন। সরলপ্রাণ জামোরিন চিনতে পারেননি—বণিকের ছদ্মবেশে এই লুঠেরাদের। ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের নৌবাণিজ্যের অধ্যক্ষ হয়ে আসে আলবুকার্স (Alfanso Albuquerque)। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সহসা অতর্কিত আক্রমণে সমৃদ্ধ বন্দর "সোয়া" দখল করে। সময়টা ১৫১০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর। পূর্বভারতে বিশেষ করে বঙ্গদেশের নদীনালায় পর্তুগীজ বোম্বেটেদের উপদ্রব আরম্ভ হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের অনুগ্রহে হুগলী নদীতীরে ব্যান্ডেলে পর্তুগীজরা একটা গীর্জা তৈরী করে (১৫৯৯)। বণিকবৃত্তি ত্যাগ করে পর্তুগীজরা বোম্বেটেগিরি শুরু করেছিল। তাদের শায়েস্তা করার ভার পান প্রতাপাদিত্যের ঢালী ও নৌবাহিনীর অধিনায়ক মদন রায় মল্ল। মাতলা নদীতে তিনি পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিধবস্ত করেন। পর্তুগীজরা এরপর চট্টগ্রামের দিকে পলায়ন করে। চট্টগ্রামে কর্নফুলির মোহনায় "বেঙ্গালা" নামে একটি বন্দর-নগরী গড়ে তোলে (১৬৫২)। মদনমল্লের বীরত্বের খ্যাতি হেতু দক্ষিণবঙ্গের একটি পরগণার নাম হয় 'মদনমল্ল' —বিকৃত উচ্চারণে যেমন 'মেদনমল্ল' পরগণা। ভারতের ক্ষাত্রশক্তি নির্বীর্য হলে, ভারতের নানাপ্রান্তে ধর্মগুরু ও সাধকরা ভারতের সংহতি, সংস্কৃতি ও ধর্মরক্ষার্থে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন। এঁদের মধ্যে উত্তর ভারতের শিখগুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮), মধ্যভারতে-কবীর দাদু ও দক্ষিণ ভারতে নামদেব এবং অসমে শঙ্করদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে যে নামটি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে—সেটি শ্রীচৈতন্যের। এঁর পূর্বপুরুষ তুর্কি অত্যাচারে ভাগীরথী তীর থেকে উৎকলের যাজপুরে, সেখান থেকে শ্রীহট্টে আশ্রয় নেন। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে আসেন বিদ্যালাভার্থে। এখানেই বিবাহ করেন। এঁরই পুত্র শ্রীচৈতন্য। ১৪৮৫ (মতান্তরে ১৪৮৬) খ্রীষ্টাব্দে এঁর আবির্ভাব। অসামান্য ধীশক্তি বলে তিনি বুঝেছিলেন, অস্ত্রশক্তিতে বিদেশী আগ্রাসনকারীদের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। ধর্মান্তকরণ রোধও অসম্ভব। সঙ্কীর্ণতা মুক্ত নবধর্ম প্রবর্তনের প্রয়োজন, যা আচণ্ডাল সমস্ত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে আশ্রয় দেবে। তাই সনাতন গোস্বামীকে দিয়ে নব্য উদার স্মৃতি গ্রন্থ 'হরি ভক্তিবিলাস' প্রণয়ন করান। ফলে হিন্দু সমাজ হয়েছিল সংহত বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে। শ'দুয়েক বছর পূর্বে আচার্য শঙ্কর (৭৮৮-৮২০) ভারতবর্ষকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক কদাচার থেকে রক্ষা করে জাতীয় ধর্ম সংহতিকে রক্ষা করেছিলেন।

এই জন্য সারা ভারতপরিক্রমা করে বিরুদ্ধবাদীদের পরাস্ত করে ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। উত্তর ভারতে হিমালয়ের কোলে যোশী বা জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ, ও পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ-জাতীয় সংহতির প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও ধর্মীয় সংহতি সাধনের নিমিত্ত ও ইসলামী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন সারা ভারত পদব্রজে পরিক্রমার পরিকল্পনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে অত্যাচারী কাজীকে নির্বিরোধ অহিংসা সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে নত করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে-মহাত্মা গান্ধী তাঁর সেই পন্থা অনুসরণ করেন।

শ্রীচৈতন্য-সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট ও অসম ভ্রমণ করেছিলেন। গয়া গমন করে ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেন। রাঢ় দেশও পরিভ্রমণ করেছিলেন। এবার দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার কথা চিন্তা করেন। উড়িষ্যায় ও বিজয়নগরে তখনও হিন্দু রাজত্ব বর্তমান। পুরীতে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা ভারতে ধর্ম সংহতির বন্ধনসূত্র রচনা করবেন। আর উত্তর ভারতে বিচূর্ণ তীর্থস্থানগুলির উদ্ধারের পরিকল্পনাও করেন। এজন্য দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের আকর্ষণ করবেন। ১৫১০ সালের গোড়ার দিকে গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে অনেক মন্দির ভগ্ন করেন। চৈতন্য এই দুর্ঘটনার সময় হিতৈষীদের নিষেধ অমান্য করে নীলাচল পথে যাত্রা করেন। সঙ্গী ভ্রাতৃপ্রতিম নিত্যানন্দ, গদাধর গোবিন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ আর গায়ক মুকুন্দ। তাঁর ভারতপরিক্রমার কাল (১৫১০-১৫১৫)। স্বামী বিবেকানন্দও জাতীয় সংহতির কারণে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন শঙ্করাচার্য ও শ্রীচৈতন্যের মতো (১৮৮৯-১৮৯৩)।

নীলাচল পথে ঃ শান্তিপুর থেকে শ্রীচৈতন্য গঙ্গার তীরে ত্রিবেণী হয়ে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শাক্ততীর্থ কালীঘাট তাঁর যাত্রাপথে পড়লেও সেখানে পদার্পণ করেননি। শ্রীচৈতন্যের কোনও প্রামাণ্যগ্রন্থে কালীঘাটের নামোল্লেখ নেই। হিমালয় উৎসারিত সুরধুনী, বঙ্গে ভাগীরথী নামে প্রবহমান। দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ধারাটি আলিঙ্গন রূপে খ্যাত। আদিগঙ্গার স্রোত তখন প্রবল, বিস্তারও বিপুল। ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে জ্যাও-ডি-ব্যারোস নামে এক পর্তুগীজ নাবিকের আঁকা মানচিত্র আদি গঙ্গার ধারাটিকে বেশ স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। তার তীরবর্তী যে নগর বন্দরগুলির নাম আছে তার মধ্যে "ময়দা" গ্রামটি আজও বর্তমান। কারও মতে শ্রীচৈতন্যদেব গঙ্গাস্রোতে নৌকা ভাসিয়ে যাত্রা করেছিলেন। এ ধারণার কারণ—'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বণিকেরা গঙ্গার স্রোত পথেই বঙ্গোপসাগরে পড়ে সিংহল, যবদ্বীপ, বলি, বোর্নিওতে বাণিজ্যে যেতেন। সপ্তদশ শতকে লেখা কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" পুঁথিতে ছত্রভোগ, বিষ্ণুপুর, জয়নগর প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। বহড়ু, সূর্যপুরের পর বারুইপুরের নাম পাওয়া যায়। কল্যাণপুর, মালঞ্চের নামও আছে। রাজপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত 'বড়দহ' বন্দরও 'বেড়দার খাল' নামে বিদ্যমান।

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ২৪ পরগণনার সুপ্রাচীন গ্রাম বোড়াল সংলগ্ন গড়িয়ার বৈষ্ণবঘাটায় আসেন। জনশ্রুতি এখানে এক বটবৃক্ষতলে মহাপ্রভু কীর্তনানন্দে কাটান। তাই স্থানটার নাম হয় বৈষ্ণবঘাটা। মহাপ্রভু যখন আদিগঙ্গার তীরে তীরে রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া অতিক্রম করেছিলেন। তখনকার এসব গ্রামের নামের উল্লেখ পুঁথিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে মৃত্তিকা খননকালে নাভি পর্যন্ত প্রোথিত একটি কৃষ্ণমূর্তি (হরি) পাওয়া গেলে গ্রামের নাম হয় হরিনাভি। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মদনরামের প্রতিষ্ঠিত জনপদের নাম 'রাজপুর'। প্রাচীন পুঁথিতে মদন রামকে 'রাজা' বলা হয়েছে। রাজা মদন রায়ের পুর (নগর), তাই রাজপুর নাম। চৈতন্যের সমসাময়িক কালে মাহিনগরের বসু বংশীয় পুরন্দর খাঁ (নেতাজী সুভাষদের পূর্বপুরুষ) আদিগঙ্গা স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে গৌড়ে যেতেন। তিনি ছিলেন গৌড় নবাবের নৌ সেনাপতি ও অর্থমন্ত্রী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোডের ধারে-বড়দহ বন্দরের কাছেই মালঞ্চের কালীকে চৈতন্য কৃষ্ণ-এ রূপান্তরিত করে "কৃষ্ণকালীতে" পরিণত করেন। এরপরেই মহাপ্রভু বারুইপুরে পদার্পণ করেন। গঙ্গাতীরের 'দ্বারীর জাঙ্গাল' ধরে তিনি গিয়েছিলেন। দ্বারীর জাঙ্গালের বর্তমান নাম দ্বারীর রোড। রাজপুর ও জগদ্দল গ্রামে আজও বিদ্যমান এই রাস্তাটি। বারুই কথাটির অর্থ পানচাষী। পানচাষীদের গ্রাম বারুইপুর তখন সমৃদ্ধ ছিল না। তখন এর নাম ছিল 'অটিসারা'।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে, মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রাপথের যে বর্ণনা আছে, তাতে দেখা যায়—

"হেন মতে প্রভুতত্ত্ব কহিতে কহিতে,
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরীতে।
সেই 'আটিসারা' গ্রামে মহাভাগ্যবান,
আছেন পরম সাধু শ্রী অনন্তরাম।।'

এই "আটিসারা" নগরী বর্তমানে দক্ষিণ বারুইপুরের অন্তর্গত। বারুইপুরের পুরানো বাজারের কাছে "মহাপ্রভুতলা" বলে জায়গাটিকে পূর্বে অটিসারা বলা হত। জায়গাটি একেবারে আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত। এখন এখানে একটি শ্মশান আছে। কাছেই ছিল সাধু অনন্তের কুটির। এঁরই কুটিরে শ্রীচৈতন্যদেব এক রাত্রির জন্য অতিথি হয়ে সারারাত্রি কীর্তনানন্দে কাটিয়ে ছিলেন। আজও এই জায়গাটির নাম 'কীর্তনখোলা'।

'চৈতন্যভাগবতে' আছে—

"রহিলেন প্রভু আসি অনন্ত-আলয়ে।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়ে।।
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর।।
সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে।।"

(চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস)

কয়েক বছর পূর্বে মজা আদি গঙ্গাতীরে পাওয়া গেছে অনন্ত সাধুর প্রতিষ্ঠা করা বিগ্রহ। সেখানে রাম দাস বাবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মঠ। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে এখানে চৈতন্যের পদার্পণ তিথি স্মরণ করে হয় উৎসব। আনুমানিক ৯১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ ফাল্গুন (১৫১০) চৈতন্যদেব এখানে আগমন করেন। আজও স্থানটি অষ্টপ্রহর কীর্তনানন্দে মুখর হয়ে আছে।

পান চাষীদের নগণ্য গ্রাম বারুইপুর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ইংরাজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settle-ment) পর (১৭৯৩ খৃঃ)। মদন রায় মল্লের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজবল্লভ রায় কুলদেবী আনন্দময়ীকে নিয়ে কাছারীবাড়ী বারুইপুরে চলে এসে জমিদার হয়ে বসেন। কারণ জমিদারী ছিল দেবত্র। রাজপুরের শ্রীবৃদ্ধি অস্তমিত হয়। বারুইপুর হয় মহকুমা সদর—এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন (১৮৬৫)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—এঁর কোর্টে সওয়াল করে গেছেন (১৮৬৭) বারুইপুর নামের আড়ালে শ্রীচৈতন্যের পদধূলিধন্য অটিসারা হারিয়ে যায়।

গড়িয়ার কাছে আদিগঙ্গার ধারাকে কাটিয়ে বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেন মেজর টলিস নামে এক ইংরাজ বণিক। কাটানো খালের নাম হয়—"টালির নালা" (১৭৭৭ খৃঃ)। সম্প্রতি এই নালার উপর দিয়ে চলছে—মেট্রো রেল। আদি গঙ্গার মূলধারা বোড়াল শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আছে। শ্রীচৈতন্য এই মন্দিরে প্রবেশ করে ছিলেন কিনা—কোনও পুঁথিতে তার উল্লেখ নেই। শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে আটিসারা (বারুইপুর) ত্যাগ করে সূর্যপুর (পরবর্তীকালে এর নামকরণ হয় প্রতাপাদিত্যের বিখ্যাত বীর সেনাপতি সূর্যকান্ত ওহের নামে) গ্রাম পার হয়ে হয়ে নগর, মজিলপুর হয়ে মথুরাপুরে উপস্থিত হন। তারপর পৌঁছান "ছত্রভোগ" বন্দরে। শ্রীচৈতন্যদেব ছত্রভোগ বন্দরে গঙ্গাশতমুখী দেখেছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখে গেছেন,—মহাপ্রভু—

"এই মতো জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতুহলে।।"

বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসামঙ্গলে' আছে—

"ছত্রভোগে গিয়ে রাজা (চাঁদ সদাগর) তীর্থ কার্য করিলা তথায়।"

এই ছত্রভোগে-ফৌজদার রামচন্দ্র খাঁর সাহায্যে শ্রীচৈতন্যদেব নৌকায় মেদিনীপুরে উড়িষ্যার সীমানায় পৌঁছান। বাংলার নবাব হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের তখন যুদ্ধ চলছিল। রামচন্দ্র খাঁ ছিলেন হুসেন শাহের সীমান্ত রক্ষক ফৌজদার। নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে তিনি চৈতন্যদেবকে গোপনে মেদিনীপুরে পৌঁছে দেন। সেখান থেকে পদব্রজে মহাপ্রভু—নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

শান্তির ললিত ধারা— হরিনাম সংকীর্তন

সংকর্ষণ মাইতি

চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতাগণ এবং চৈতন্যদেবের ভাবশিষ্যগণ মনে করেন ভগবান নারায়ণ কলিযুগে গৌরাঙ্গরূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নারায়ণ চারযুগে চার রূপ ধারণ করে যুগাবতার হয়েছিলেন।

সত্যযুগে—শ্রীবিষ্ণু, ত্রেতাতে—রামচন্দ্র, দ্বাপরে—শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে—শ্রীচৈতন্য।

অধর্মের দ্বারা ধর্ম যখন লাঞ্ছিত, সমাজের মানুষ যখন নির্যাতিত, তখনই ভগবান এসেছেন ধরাধামে ধর্ম রক্ষার্থে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

"পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। গীতা হলো ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী—যা হিন্দুদের চলার পথে উপদেশাবলী। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত শ্লোকে 'ধর্ম' কথাটি কোনও সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি, সংস্কার, রীতিনীতি এবং পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক মত অর্থাৎ ত্মন্দ্বপ্তুনন্ধক্স নয়। এখানে 'ধর্ম' কথাটি হলো সৎকর্ম, সদাচার, পুণ্যকর্ম, কর্তব্যকর্ম, সমাজ হিতকর ও মানুষের মানসিক উন্নতির বিধি এবং সুনীতি অর্থাৎ ত্তপ্সক্দ্ধপ্তুনন্ধন্তু আর হিন্দুত্ব হলো জীবনযাপনের একটি ধরন। (ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা) এই জীবন যাপনের জন্য নীতিশাস্ত্রের প্রবর্তন—যা ধর্মশাস্ত্র নামে অভিহিত। এই ধর্ম শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে হিন্দুর জীবনচর্চা—যা সামাজিক মানসিক উন্নতি সূচিত করে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটটি কেমন ছিল? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইখতারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি হঠাৎ গৌড় আক্রমণ করে বসলেন। রাজা লক্ষণ সেন কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালালেন। শুরু হলো মুসলিম রাজত্ব। মুসলিম রাজত্বের সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব তাঁর সময়কার সমাজের ভয়ঙ্কর রূপটি দেখে আতঙ্কিত হলেন। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কুসংস্কার, অসাম্য, বিচ্ছিন্নতাবাদ সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে। দুর্বল নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অসহায়। নিম্নবর্ণের অসহায়তার সুযোগটি নিয়েছিলেন তৎকালীন মুসলমানরা। জোর করে ধর্মান্তরিতকরণের ব্যবস্থা করা হতো। আবার কেউ কেউ বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এবং মুসলমানদের রোষানলে পড়ে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব এসব দেখে উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দুসমাজের অবক্ষয়ের জন্য হিন্দুরাই দায়ী। প্রেমধর্মের অভাবের জন্য হিন্দুদের মনে আস্থা ফেরাতে হবে। অজ্ঞ, সংকীর্ণমনা, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিন্দুদের জাগাতে হবে। জাতিভেদ হিন্দুসমাজকে ক্ষয়িষ্ণু ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এঁদের চৈতন্যোদয় না হলে সমগ্র হিন্দু সমাজ শেষ হয়ে যাবেই। চাই একতা—চাই সংঘবদ্ধতা। তিনি গঠন করলেন ঈশ্বরপ্রেমী বৈষ্ণব গোষ্ঠী। উদ্দেশ্য—ঈশ্বর প্রেমে মন সমর্পণ হলেই ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। এই বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে ছিলেন তিনি নিজেই। এছাড়া নিত্যানন্দ শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত, মুরারী গুপ্ত, সদাশিব পণ্ডিত প্রমুখ। এঁদের নিয়ে চৈতন্যদেব শুরু করলেন হরিনাম সংকীর্তন। উচ্চবর্ণে জাত পণ্ডিত প্রবর চৈতন্যদেবকে অহমিকা স্পর্শ করতে পারেনি। বরং মানুষের মনের সংকীর্ণতাকে কেন্দ্র করে যে ধর্মগত বর্ণগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তার মর্মমূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল এই হরিনাম সংকীর্তন। বলেছিলেন—

"কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলের বিচার"—(চৈতন্য চরিতামৃত)। তাঁর শ্রীমুখের এই ঘোষণা শুধু মুখে সীমাবদ্ধ ছিল না, মুখ ও মনের সমন্বয় ঘটিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষ মায় যবন হরিদাসকে বুকে টেনে নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বর্ণগত, জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি। তাঁর প্রেমধর্মের ছত্রতলে ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল সব একাকার। বর্ণহিন্দুরা চৈতন্যদেবের পথ অনুসরণ করে নিম্নবর্ণের মানুষকে বুকে টেনে নেন। নবদ্বীপবাসী হরিনাম সংকীর্তনে মাতোয়ারা। জাতপাত সংকীর্ণতা শিকেয় ওঠে।

'হরি হরি বলে গোরা নাচে বাহু তুলি,
কেবা আপন কেবা পর সবই গেছে ভুলি।
অদ্বৈত-শ্রীবাস নিতাই-গদা-হরিদাস
জাতি ভুলে সবে মিলে করে কোলাকুলি।'....

একেই বলে জাগরণ। মহাজাগরণ। হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়েই তাঁর সামাজিক সাম্যবাদ শুরু। শুধু তাই না, দোর্দণ্ডপ্রতাপ কাজি সাহেবের অন্যায় অবিবেকী ফতোয়া জারির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন সমগ্র হিন্দু সমাজ। খোল-করতাল-মৃদঙ্গ বাদ্যসহ হরিনাম সংকীর্তনকে মূলধন করেই। কাজিসাহেব হরিনাম সংকীর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন—যে কীর্তন করবে—'সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু'-(চৈ. চরিতামৃত/আদি-১৬)।

চৈতন্যদেবও প্রতিস্পর্দ্ধা দেখিয়ে বলেছিলেন—

'সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন'—(চৈতন্যভাগবত/মধ্য-২৩)। কথার সঙ্গে কাজ। হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে মানুষের মিছিল ঘিরে ফেলে কাজির বাসগৃহ। ভয়ে কাজি ঘরের ভেতর।

(কীর্তনের ধ্বনিতে কাজি লুকাইল ঘরে।' (চৈ. চ. আদি-১৬) কাজি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'History of Bengali Literature' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

'It was perhaps the first act of civil disobidience in the history of India.'

গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য এবং বর্তমানে ঘেরাও শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে ভারতবর্ষে প্রথম আইন অমান্য ও ঘেরাও-এর কাজটির সূচনা করেছিলেন চৈতন্যদেব।

হরিনাম সংকীর্তন এবং ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের পরিচয় ও তাৎপর্য ঃ

হরিনাম মহামন্ত্র যেমন নবদ্বীপের বর্ণনির্বিশেষ হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করেছিল তেমন শ্রীচৈতন্যের ভারত পরিক্রমায় এই হরিনাম মহামন্ত্র অন্যান্য প্রদেশের মানুষকে ঐক্যডোরে বেঁধেছিল। (উল্লেখ্য—১৫১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি নীলাচল যাত্রার মাধ্যমে তাঁর পরিক্রমা শুরু হয়েছিল। ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পরিক্রমার পাঁচশো বছর পূর্তি হচ্ছে) হরিনাম মহামন্ত্রটি হলো বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট ষোলটি নাম।

> **"উচ্চবর্ণে জাত পণ্ডিত প্রবর চৈতন্যদেবকে অহমিকা স্পর্শ করতে পারেনি। বরং মানুষের মনের সংকীর্ণতাকে কেন্দ্র করে যে ধর্মগত বর্ণগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তার মর্মমূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল এই হরিনাম সংকীর্তন।"**

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

সরলার্থ হলো—'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণের শক্তি (রাধিকা), কৃপাপূর্বক আমায় তোমাদের সেবায় নিয়োজিত কর। 'হরে' হলো কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি হরা (শ্রীমতী রাধারাণী)। 'কৃষ্ণ' এবং 'রাম' হলো সর্বাকর্ষক, সর্ব আনন্দের আধার পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য নাম।'

(কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা/ভক্তি বিকাশ স্বামী/ইস্কন)

হরিনাম মহামন্ত্রটিতে কার স্তুতি রয়েছে এ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। মহামন্ত্রটিতে মূল তিনটি তত্ত্ব রয়েছে। হরে, কৃষ্ণ ও রাম। এই তিন তত্ত্বটিতে কারা? 'হরে'-তে রয়েছেন স্বয়ং রাধিকা। 'হরে—ভানুসুতা যেই কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি।' কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা-পুস্তকে একই মত রয়েছে। মতান্তরে—'হরে'—সাক্ষাৎ শ্রীহরি কলৌ চৈতন্য গোঁসাই। 'হরে'—এখানে স্বয়ং চৈতন্য গোঁসাই। (কৃষ্ণভক্তি রসামৃত)

'কৃষ্ণ'-নন্দসুত বলে যারে ভাগবতে পাই, সেই কৃষ্ণ এবে চৈতন্য গোঁসাই। মতান্তরেও দ্বিমত নেই। 'কৃষ্ণ'—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোঁসাই। (কৃষ্ণভক্তি রসামৃত)

'রাম'—দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রসে অবিরাম, অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম।' (কৃষ্ণভক্তি রসামৃত)। মতান্তরে—'রাম'—শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার, তেঁই রাম নাম তাঁর বিদিত সংসার।' (কৃষ্ণভক্তি, রসামৃত—পৃষ্ঠা-৪১) দেখা যাচ্ছে, 'রাম'-শব্দটিতে এখানে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ—দুইজন রয়েছেন। তবে ধারণা হয়—শ্রীচৈতন্যদেব এই 'রাম' নামের প্রচ্ছন্নে রয়েছে। কারণ ভগবান স্বয়ং নারায়ণ চার যুগে চার অবতার রূপে অবতীর্ণ। কলিযুগে চৈতন্যরূপে। কাজেই যিনিই রাম, তিনিই এখানে চৈতন্য। আবার চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ। মজার ব্যাপার, ভক্তশিষ্যদের তিনি কৃষ্ণভক্তির কথা বারে বারে বলেছেন। চৈতন্যভাগবতের-২৩ অধ্যায়ে রয়েছে—'প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার। কৃষ্ণগুণ নাম বই না বলহ আর।' আবার নিজেও রাধাভাবে জগৎকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে মাতিয়ে দিয়েছেন। "শ্রীমহাপ্রভু ষোল নামকে প্রতিপদে প্রতি অক্ষরে শ্রীরাধা ভাবে উজ্জ্বল মাধুরী প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।" (শ্রী হরিনাম দীপিকা গ্রন্থ)।

হরে কৃষ্ণ ও রাম—তিন তন্ত্রের অবস্থান তত্ত্ব ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা যাক। তিন তন্ত্রের অবস্থিতি আমাদের মুখমণ্ডলেই।

"হ-কারো নাসিকাং পাতু, রে-কারে বদনং তথা।

কৃ-কারশ্চ ভ্রুবোর্মধ্যে, ষ্ণ-কারো তালুতে তথা।।

রা-কারশ্চ ক্ষুযোর্মধ্যে, ম-কারো গণ্ড যুগ্মকং।।"

অর্থ—হ অক্ষর নাসিকায়, রে-অক্ষর বদনে, কৃ-অক্ষর ভ্রূমধ্যে, ষ্ণ-অক্ষর তালুতে, রা অক্ষর চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে এবং ম অক্ষর যুগ্ম গণ্ড স্থলে।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটির ষোলটি নামের মধ্যে রয়েছে ৮টি হরে তত্ত্ব, ৪টি কৃষ্ণ তত্ত্ব এবং ৪টি কৃষ্ণ তত্ত্ব।

হরে তত্ত্ব ও ফলাফল
১ম হরে-চন্দ্রাবলী/২য় হরে-শ্রীরাধা
৩য় হরে-সুভাষিণী/৪র্থ-হরে সিংহাসন
৫ম হরে-সুদর্শন/৬ষ্ঠ হরে-শেষদেব
৭ম হরে-সাবিত্রী/৮ম হরে-রেবতী।

'হ-কারে লিঙ্গুলবর্ণ হয় সর্ব শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত পাপ করে নষ্ট।।
রে-কারেতে রক্তবর্ণ গোপাল নির্ণয়। গুর্বাঙ্গনা উপগত পাপ হয় ক্ষয়।।"

কৃষ্ণ তত্ত্ব ও ফলাফল
১ম কৃষ্ণ-শ্রী গোবিন্দ/২য় কৃষ্ণ-বাসুদেব
৩য় কৃষ্ণ-জগন্নাথ/৪র্থ কৃষ্ণ-বলভদ্র

"কৃ-কার কজ্জল বর্ণ উপপাতক নাশে। গতিশক্তি রতি প্রেম ইহাতেই আসে।।
ষ্ণ-কার লোহিত বর্ণ নরক হইতে। মানবে উদ্ধার করে পাপ জন্মার্জিতে।।"

রাম তত্ত্ব ও ফলাফল
১ম রাম-শ্রীরাধিকা/২য় রাম-লক্ষ্মী
৩য় রাম-সরস্বতী/৪র্থ রাম-সুভদ্রা

'রা-কার বর্ণ হয় চন্দ্র সূর্য জ্যোতি। অজ্ঞান তমনাশক বর শক্তি ধৃতি।
ম-কার স্বরূপ জ্যোতি কলঙ্ক রহিত। নিত্য স্থায়ী হয় মিথ্যাপাপ বিনাশিত।।"

সমাজে 'রাম'-তত্ত্বের গুণাগুণ লক্ষ্য করা গেছে। মুখ ফসকে কেউ কারো নিন্দা বা মিথ্যা কথা বলে ফেললে হঠাৎ নিজেকে তিনি সামলে নেন জিভ কেটে, দু' হাত কান স্পর্শ করে 'রাম রাম' বলে। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাপবাদ, বা মিথ্যা কথা বলাও যে অন্যায়, পাপ তার স্খালন বা সদ্য বিনষ্ট্য 'রাম' নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়েই।

বত্রিশ অক্ষরের পরিচিতি ও অবস্থান ঃ

"ষোল সখা ষোল সখী বত্রিশ অক্ষর
হরিনাম তত্ত্ব ধর্ম অতি গূঢ়তর।"
(তত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী)

ষোড়শ হরি নামের বত্রিশ অক্ষরে ষোলজন সখা ও ষোলজন সখী আমাদের দেহে বিরাজমান। বলা যেতে পারে শারীরতত্ত্ব ভিত্তিক হরিনাম মহামন্ত্রটি। প্রথম ষোলটি অক্ষরে রয়েছেন সখীগণ এবং দ্বিতীয় ষোলটি অক্ষরে ষোলজন সখা দেহমধ্যে ও দশদিকে বিরাজমান।

সখীগণ

হ-তে শ্রীললিতা সখী মস্তকেতে।
রে-তে শ্রীবিশাখা দক্ষিণ বাহুতে।।
কৃ-তে চম্পকলতা সখীকণ্ঠে রয়।
ষ্ণ-তে চিত্রাসখী বাহুতে শোভয়।।
হ-তে রঙ্গদেবী সখী থাকে হাতে।
রে-তে সুদেবী যে থাকয়ে পৃষ্ঠেতে।।
কৃ-তে তুঙ্গবিদ্যা বদন উপরে।
ষ্ণ-ত্রে ইন্দুরেখা শ্রবণ বিবরে।।
কৃ-তে শশীরেখা রহে ভ্রুকু যুগে।
ষ্ণ-তে বিমলা সখী ভ্রুর ডানভাগে।।
কৃ-তে পালিকা সখী ভ্রূর বামে রয়।
ষ্ণ-তে লবঙ্গমঞ্জরী থাকয়ে হৃদয়।।

(এরপর ১৫ পাতায়)

সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি

২৮শে অগ্রহায়ণ স্বস্তিকায় দেবব্রত চৌধুরীর সরকারী কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের করের টাকায় সরকারী কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ সকল ধরনের সরকারী কর্মচারীদেরই বেতন থেকে কর দিতে হয় তো বটেই উপরন্তু তারাও সাধারণ মানুষের মতোই কর প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের যেমন দু'ভাবে কর দিতে হয়, সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র একবারই কর দিতে হয়। তাই একজন সরকারি কর্মচারীকে একজন সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি কর প্রদান করতে হয়। তাই প্রতিবেদনের উপরিউক্ত ধারণা সুস্পষ্ট নয়।

এছাড়াও প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারীদের 'বেতনবৃদ্ধি ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে' ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি এভাবে বলা হয় যে একজন মজুরের মজুরী যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, কথাটা কি অবাস্তব? না একথা বাস্তবসম্মত। কারণ সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ্যভাতা বছরে দু-একবার দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে একজন কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধি আহামরি কিছু হয় না। এ ধরনের বেতনবৃদ্ধি জিনিসপত্রের বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং বেতনবৃদ্ধি নিয়ে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা পৌঁছে যায়। আর সরকারী কর্মচারীদের পে-কমিশনের ভিত্তিতে বেতনবৃদ্ধি দশবছর অন্তর হয়ে থাকে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক পে-কমিশনের প্রায় দশবছর আগে শেষ পে-কমিশনের ভিত্তিতে বেতনবৃদ্ধি হয়েছিল। তাই এই দীর্ঘ দশবছরে একজন সরকারী কর্মচারীর (বর্তমান পে-কমিশন বের হবার আগে পর্যন্ত) শুধুমাত্র মহার্ঘ্যভাতার ভিত্তিতে বেতনবৃদ্ধি আহামরি কিছু নয়। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণামাত্র। কিন্তু বিগত দশবছরে একজন মজুরের মজুরী কত বৃদ্ধি পেয়েছে? জিনিসপত্রের বাজার দর কোথায় পৌঁছেছে? একজন ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান নয় কি? বিভিন্ন ধরনের কর্মচারীর মজুরের আয়ের সীমা কোথায় পৌঁছেছে? সুতরাং দীর্ঘ দশবছর পর পে-কমিশনের ভিত্তিতে বেতন বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য মজুর বা কর্মচারীদের আয়ের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের বেতন সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো নাকি? এর সঙ্গে জিনিসপত্রের বাজার দরের সম্পর্ক কি? সরকারী কর্মচারীদের জন্য কি বাজারে আকাল দেখা দেয়। যার ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে? আসলে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী ব্যবসায়ীরাই। ব্যবসায়ী বিভিন্ন কোম্পানী জিনিসপত্রের দাম অকারণে সুকৌশলে এমনভাবে বৃদ্ধি করেন যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। বাজারদর বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির কোনও সম্পর্কই নেই। সবশেষে বলা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি করা হয়। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য দীর্ঘদিনের। আর 'আসি যাই মাইনে পাই' কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি। কিছু সরকারী কর্মচারীর নিজ নিজ ক্ষেত্রে গাফিলতির জন্য সকল কর্মচারীরাই দায়ী হয়ে যান। অবশ্যই এটা কাম্য নয়। তবে বেতনবৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা না পৌঁছানোই শ্রেয় বলে মনে হয়।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

প্রতিবেদকের উত্তর ঃ

প্রতিবেদক নিজেও সরকারি কর্মচারী ছিলেন। সরকারি কর্মীরা যে ট্যাক্স দেন তা থেকেই কি বেতনের পুরোটা এসে যায়? এদেশের নাগরিক হিসেবে তো ট্যাক্স দিতে সকলেই বাধ্য। শুধু বেতন নয়, সরকারি অফিসের ব্যবস্থার খরচ কোত্থেকে আসে? জননেতারাও বেতন, ভাতা পান। কেন্দ্র-রাজ্য কর্মীদের বেতন-বৈষম্যের কথাটা তেমন সত্যি, যেমন সত্যি সরকারি কর্মী ও জনগণের জীবনযাত্রার বৈষম্য। যা অবশ্যই দৃষ্টিকটু। এটাই যথেষ্ট।

আত্মপরিচয়

স্বস্তিকার ২১ ডিসেম্বর ০৯ সংখ্যার প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের একটি শব্দ আমাদের সকলকেই "আত্মপরিচয়" সংকটে ফেলে দিয়েছে। 'চা বাগানে...পাচার চক্র" প্রতিবেদনে মোট তিন বার ব্যবহৃত আপত নিরীহ শব্দটি আবারও দেখিয়ে দিল মেকেলেওয়ালারা কতটা শক্তিশালী। তাদের মিথ্যার জাল আমাদের কিভাবে আঁকড়ে ধরেছে। প্রতিবেদক বার বার সমাজে এক বিশেষ অংশের জন্য 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তবে আমরা কারা? আমাদের পরিচয় কি? আমরা কি দেশের আদিবাসী নই না আমরা নবীনবাসী? অর্থাৎ বহিরাগত? তবে আমাদের উৎস কোথায়?

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত "বিশ্ব প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলনে" এক বাক্যে বিশ্বের তাবড় তাবড় ঐতিহাসিকরা আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে নস্যাৎ করে মেহেরগড় সভ্যতা থেকে ভারতীয় সভ্যতার পৌনঃপুনিক বিবর্তনের ধারাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য ১৯৭৪ সালে পশ্চিম উত্তর পাকিস্তান এবং অধুনা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত নব্যপ্রস্তর -যুগীয় মেহেরগড় সভ্যতাই বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা।

বর্তমান ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে অবশ্য মেহেরগড় সভ্যতার জয়গান করার ঠিক পরের পৃষ্ঠাতেই আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে লেখকদের কাছে সিলেবাস বড় দায়। অভিভাবকদের কাছে নম্বর পাওয়াটাই শেষ কথা। ফলে শিক্ষার্থীরাও না বুঝেই নোট মুখস্ত করতে ব্যস্ত। সুতরাং প্রতিবেদককে খুব বেশী দোষ দিই কি করে?

ড. এন. এম রাজারাম, ডেভিড ফ্রলে, জি. এফ. ডালেস, এস.পি. গুপ্তের মত স্বনামধন্য ঐতিহাসিকরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমরা আর্যদের বহিরাগত বলবই। যদিও "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" তেও আর্য শব্দটিকে গুণবাচক বলে স্বীকার করে মেহেরগড় সভ্যতার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা পরিষ্কার বলা আছে।

—প্রণয় রায়, কলকাতা-৫০

সুরক্ষা

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন গুণগ্রাহী পাঠক।

ভারতে জঙ্গি আক্রমণ, অনুপ্রবেশ, মেকী-সেকুলারদের ভারতে রাজ্যশাসন, চীনের ভারত-বিরোধিতা ইত্যাদি যখন তুঙ্গে, তখন কলকাতার প্রান্ত-অঞ্চলে অবস্থিত ভারতীয় প্রতিরক্ষা জাহাজ নির্মাণ সংস্থা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ৬০ মিটার লম্বা চারটি বড় কামান বিশিষ্ট দ্রুতগামী আক্রমণাত্মক জাহাজ তৈরীর প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহে ব্যস্ত। এতে পশ্চিবঙ্গের সুরক্ষা কি ভবিষ্যতে সহজ হবে?

বিশেষ অনুরোধ এই যে এ ব্যাপারে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের দেশভক্তগণকে অবহিত করে একটু আলোড়ন ও আন্দোলন গঠন করলে ভালো হয়।

—অমরনাথ দে, রামহরি ঘোষ লেন, কলকাতা-৯

হজযাত্রী বনাম গঙ্গাসাগরযাত্রী

গঙ্গাসাগর মেলা আগত প্রায়। ইমিধ্যেই সাধু-সন্তরা আসতে আরম্ভ করেছেন। এ বৎসর ভারত থেকে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার (১.৬৭ লক্ষ) মুসলমান হজ করতে মক্কাশরিফ গেছেন। ভারত সরকার তাদের প্রত্যেককে ১৬ হাজার টাকা করে বিমান ভাড়া ভরতুকী দিয়েছেন, তাছাড়া তো অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছেই, যথা বিমান যাত্রার পূর্বে হজ হাউসে থাকা এবং রাজকীয় খানাপিনা, মক্কা শরীফে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে হিন্দুতীর্থ যাত্রীদের প্রতি এই মুসলমান তোষণকারী সরকার কি অমানবিক ব্যবহার করেছে একবার শুনুন ঃ কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত যেখানে সাধারণ সময়ে ভাড়া ১৩্ টাকা, মেলার সময় সেখানে ভাড়া ৪৫্ টাকা। ধর্মতলা থেকে ৮নং লট অব্দি সরকারী ভাড়া ৩৮্ টাকা সেখানে মেলার সময় ভাড়া ৮০্ টাকা। তার উপর পঞ্চায়েৎ ট্যাক্স ১০্ টাকা। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে গঙ্গাসাগর-যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা গড়ের মাঠে এবং গঙ্গার ধারে খোলা আকাশের নীচে। অতএব সমস্ত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি যথা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হিন্দু সংহতি, আর এস এস এর তাবৎ নেতৃবৃন্দ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু মহাসভা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি একত্রিত হয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করুন এবং এই অবিচারের অবসানের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হউন।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪

চিঠিপত্র

বিবেকানন্দ সেবা পুরস্কার

কলকাতার বহুল পরিচিত সামাজিক সংস্থা 'বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়'-এর

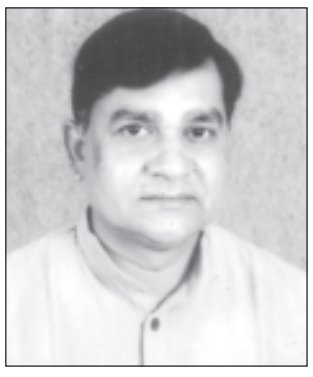

পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও বিবেকানন্দ সেবা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সেই পুরস্কার পাচ্ছেন হরিদ্বারের কুষ্ঠ রোগীদের সেবার্থে কর্মরত 'দিব্য প্রেম সেবা মিশন, হরিদ্বার'-এর প্রতিষ্ঠাতা আশিস গৌতম। আগামী ২৪ জানুয়ারি, সকাল দশটায় মহাজাতি সদনের (অ্যানেক্স) সভাগৃহে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নির্বর্তমান সরসঙ্ঘচালক শ্রী কে এস সুদর্শন। ১৯৯৭ সালের ১২ জানুয়ারি হরিদ্বারে 'দিব্য প্রেম সেবা মিশন' প্রতিষ্ঠার পর থেকে আশিসবাবু কুষ্ঠরোগীদের সেবা করে চলেছেন। তিনি সর্বত্র 'ভাইয়াজী' নামে সুপরিচিত। গত বছর (২০০৯) তাঁকে 'মহাত্মা গান্ধী পুরস্কারে' সম্মানিত করা হয়েছে।

সংস্কার ভারতী'র উত্তর কলকাতার বার্ষিক মিলনোৎসব

গত ১৯ ডিসেম্বর কলকাতার রামমোহন হলে সংস্কার ভারতী, উত্তর কলকাতা শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রাণী দত্ত। স্বাগত ভাষণে পূর্বাঞ্চল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, "ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি ও সারস্বত সাধনার সঙ্গে যুব সমাজকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার তাগিদেই সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠা। এই ব্রত নিয়েই ১৯৮৭ সাল থেকে বাংলায় কাজ করে চলেছে।

পৌরোহিত্য করেন পূর্ণচন্দ্র পুইতণ্ডী। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক আমীর চাঁদজী, প্রাদেশিক সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১৫০তম, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ১৭৫তম এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ৫২৫তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে গীতি আলেখ্য 'ওই মহামানব আসে'—সোনারপুর শাখা ও উত্তর কলকাতার শিল্পীরা পরিবেশন করে। তপন পাল, পার্থসারথি চৌধুরী, খোকন দেবনাথ ও সুপ্রীতি ঘোষের সঙ্গীত পরিবেশন অনবদ্য।

ভাষ্য রচনা করেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে অন্তিমা মান্নার (সাহু) আবৃত্তি পাঠ ছিল সাবলীল। সংযুক্তা সেনগুপ্তর নির্দেশনায় সমবেত শিশু নৃত্য এবং সাগরিকা মুখার্জী ও তুলিকা হালদারের দ্বৈতনৃত্য দর্শকদের আনন্দ দেয়। বিকাশ ভট্টাচার্য রচিত ও দেবাশিস কবিরাজ পরিচালিত 'রাজযোগী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সবশেষে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর সঙ্ঘের জেলা শিবির

উত্তর দিনাজপুর জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীতকালীন শিবির হয়ে গেল ইটাহার উচ্চ বিদ্যালয়ে। ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর তিন দিন ধরে চলা এই শিবিরের নামকরণ হয়েছিল "রাষ্ট্ররক্ষা শিবির।" প্রান্তের ঘোষণা অনুসারে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই এইরকম শীত শিবিরের অয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে ১২৫ স্থান থেকে ৩৮২ জন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করে।

শিবিরের উদ্বোধন করেন পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। সমারোপ বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ পুরো সময় শিবিরে মার্গদর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন। সহ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী ও উত্তর দিনাজপুর জেলা সংঘচালক জগদীন্দ্রনারায়ণ সরকার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

উত্তর ২৪ পরগণার বামনগাছি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ফণীভূষণ মণ্ডল তাঁর কন্যা জয়ার বিবাহ উপলক্ষে বিবাহবাসর অনুষ্ঠানে হিন্দু সমাজের সেবা কাজের জন্য সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ কার্যবাহ প্রদ্যোৎ কুমার মৈত্র মহাশয়ের হাতে ২০০১ টাকা শ্রদ্ধানিধি প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে বারাসত কার্যবাহ অরুণ দাস, বনবন্ধু পরিষদের উঃ ২৪ পরগণার কার্যকর্তা রথীন দাস ও অন্যান্য স্বয়ংসেবকরা উপস্থিত ছিলেন।

■ ■ ■

গত ২৭ ডিসেম্বর সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমার সহ কার্যবাহ ডাঃ সুমন্ত গনাই এর পুত্র সুপ্রতীক গনাই-এর শুভ অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কাজের জন্য ঠাকুর্দা ডাঃ সাধন কুমার গনাই দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ কার্যবাহ প্রদ্যুৎ মৈত্রের হাতে দুই হাজার টাকা মঙ্গলনিধি তুলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া বিভাগ প্রচারক মধুময় নাথ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দঃ বঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা, বহরমপুর নগর সহ কার্যবাহ তন্ময় দে, মানস মণ্ডল সহ স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা।

■ ■ ■

সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার মশাট খণ্ডের মুণ্ডলিকা গ্রামের স্বয়ংসেবক ও প্রাক্তন প্রচারক আনন্দমোহন বালতি-র প্রথম পুত্র বৈদান্তিক বালতি-র শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয়।

সমাবেশ সমাচার

গত ২১ ডিসেম্বর সংঘের বিভাগ প্রচারক প্রফুল্ল ঘোষের হাতে আনন্দমোহন বালতির মা শ্রীমতি বীণাপানি বালতি মঙ্গলনিধি হিসাবে ৫০১ টাকা তুলে দেন।

শোক সংবাদ

সম্প্রতি মেদিনীপুর শহরের ভোলনাথ নন্দীর পিতা মদনমোহন নন্দী (৮৫) পরলোক গমন করেন। ২ পুত্র, ১ কন্যা, নাতি নাতনি রেখে গেছেন।

■ ■ ■

সম্প্রতি মেদিনীপুর শহরের কবিতা দাঁ (৫২) রোগভোগের পর কলকাতার হাসপাতলে দেহত্যাগ করেন। কল্যাণ আশ্রমের জেলা সমিতির সদস্যা ছিলেন। পুত্র এবং স্বামী (দুলালচন্দ্র দাঁ) স্বয়ংসেবক। তিনি এক পুত্র, এক কন্যা ও নাতনিকে রেখে গেছেন।

বিবেকানন্দের স্মৃতি-তর্পণ

জলধর সেন

নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হয়েছেন এবং কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধু-বান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফত পেয়েছিলাম। সাক্ষাৎ পরিচয় কিন্তু তখনও হয়নি, হবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের নহে) দর্শন লাভ করি। দর্শন লাভ মাত্র; পরিচয় হয়নি, আর তখন

।। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত ।।

পরিচয় করার অবস্থাও তাঁর ছিল না।

এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি যখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাইনি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী—এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্বপ্রথম ডেরাডুনের এই মাস্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।

মাস্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন—একটা আড্ডার তো দরকার! যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রামসময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন!

ওরে বাবা!—সেই মাস্টারী! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা কিনা টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে যে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত! কি করি—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অংকশাস্ত্রে গাধা বানাব।

আমি মাস্টারজীর স্কুলে পড়াই, খাই-দাই থাকি। প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ন দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে জুতা, পায়জামা, লম্বা কোট এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী—আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবানন্দের জিম্বা করে দিয়ে একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে মাস্টারজীকে নমস্কার করে মহানন্দে বেড়িয়ে পড়তাম। দুই তিন দিন বন জঙ্গলে ঘুরে আবার ফিরে এসে পাগড়ী মাথায় দিয়ে ছেলেদের মাথার ভেতর সাইমাল্‌টেনিয়াস্ ইকোয়েশন্ ঢোকাতে আরম্ভ করতাম।

এই সময়ে এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সে দিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল—হৃষীকেশ।

আমার আর কিছু যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক—সে সময়, এখনকার মত, যদি ছাঁটার প্রতিযোগিতা থাকত—তাহলে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হতাম। পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত।

আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে সন্ধ্যার পূর্বেই হৃষীকেশ পৌঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন—কাজেই খুব বড়।

হৃষীকেশে তখন সন্ন্যাসীদের আহার যোগাবার জন্য গুটি দুই তিন সদাব্রত ছিল। এখন কি হয়েছে জানি নে।

আমার যদিও তখন লম্বা চুল ও দাড়ী, কম্বল ও লাঠিমাত্র সম্বল, তা হলেও আমি কখনও হৃষীকেশের কোনও কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিনি। সন্ন্যাসীর আসন আমি অধিকার করব কেন?

আমি একটা সদাব্রতের বারান্দাতেই কি শীত কি গ্রীষ্ম পড়ে থাকতাম।

আমার তো আশ্রয়স্থানের ভাবনা ছিল না—কাজেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পৌঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীগুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের সম্মুখে দেখি—জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে। তাঁরা বললেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুটীর-মধ্যস্থ ধূনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমুর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তার কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সে দিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমুর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হয়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২/৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কি না। তারপর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজী ধীরে ধীরে বললেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন। আমি মরব না—আমার অনেক কাজ আছে। আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের, বোধ হয় ১০/১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সানুচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি, শ্রীযুক্ত বিমলা এবং তাঁর খুল্লতাত সার্‌ভে অফিসের একজন প্রধান কর্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিনজন কালীবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই অফিস ছিল। কাজেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্যার ভার—বাইরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েকদিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন—দ্বিতীয় তিথি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেই জন্যই নাম "অতিথি"। তার পরদিন প্রত্যুষে তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এই বার দক্ষিণাপথে যাবেন।

সেই যে একদিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে আছে। গভীর ধর্মচর্চা, শাস্ত্রালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সারা দিনরাতের মধ্যে তাঁর মুখে শুনতে পেলাম না। শুধু গান, শুধু আনন্দ, শুধু স্ফুর্তি, শুধু রহস্যজনক গল্পগুজব। তিনি সেই দিন ও রাতটা আমাদের একেবারে আনন্দের হিল্লোলে আপ্লুত করে রেখেছিলেন। এ স্মৃতি কি ভুলবার!

(এরপর ১৩ পাতায়)

আজ যাঁর স্মৃতি তর্পণ করব, জগতের শিক্ষিত জনগণের কাছে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি সর্বজন পরিচিত ছিলেন এবং এখনও অসংখ্য জনগণের শ্রদ্ধা গ্রহণ করেছেন। —তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় যুগমানব—মহামানব, ভারতের উজ্জলরত্ন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের কথা মনে হলেই আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে। নগরাজ হিমালয়ের যেমন তুলনা নেই—ভারতশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দও তেমনই তুলনার অতীত।

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধে যে কয়টি জ্যোতিষ্ক ভারতগগন আলোকিত ও উদ্ভাসিত করেছিলেন—শুধু ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র সভ্যজগত যাঁদের অবদানে উন্নতশীর্ষ হয়েছিল—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। নিতান্ত অযোগ্য ভক্ত হলেও আজ বহুদিন পরে তাঁর স্মৃতি তর্পণ করতে বসেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি নরলোকে আমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, আজ ত্রিদিবধামে অবস্থিত হলেও তাকে তিনি ভুলতে পারেননি, তার শ্রদ্ধা-অর্ঘ তিনি গ্রহণ করবেনই।

আমার বন্ধুগণের অনেকের ধারণা—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সহপাঠী ছিলেন। —তা ঠিক নয়। আমি ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৯ অব্দে এপ্রিল কি মে মাসে জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লিজ্ (অধুনা স্কটিশ চার্চেস) কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করি। আমার সহপাঠী ছিলেন—বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। আর কে কে আমার সহপাঠী ছিলেন তাহা এখন আর মনে নাই। এতকাল পরে তাঁদের মধ্যে আর একজনের নামই আমার মনে পড়ছে—তিনি বর্দ্ধমান রাজস্টেটের সহযোগী ম্যানেজার ছিলেন—নাম হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়। আমার সেই কলেজ সময়ের বন্ধু হৃষীকেশ আজ কয়েক মাস হল পরলোকগত হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭৯ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ অব্দে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। কয়েক মাস অধ্যয়নের পরই শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করেন। সে বৎসরটি তাঁর বৃথা যায়। ১৮৮১ অব্দে তিনি জেনারেল এ্যাসেমব্লীজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ অব্দের শেষে এফ্. এ পরীক্ষা দিয়ে আমি কলেজ থেকে বের হই। ১৮৮১ অব্দে আমি ঐ কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করি। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ আমার সহপাঠী ছিলেন না। আমার কলেজ ত্যাগের পর বৎসর তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না;তবে তাঁকে আমি অনেক দিন দেখেছি এবং তিনিই যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাও জানতাম।

বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয়;তার পর যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও "সাধারণ"-দলভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠ-সমাপ্তি পর্যন্ত আমি যথানিয়মে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। কলেজ ত্যাগের পরও যখনই কলকাতায় আসতাম তখনই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগদান করতাম এবং সে সময় যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের গ্রামের সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে যেতেন। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর কলিকাতাতেও তাঁরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের এই রবি-বাসরীয় উপাসনা উপলক্ষে একটি যুবক মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম- সঙ্গীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেননি, কিন্তু ঐ ধর্মমতের প্রতি তাঁর আস্থা জন্মেছিল।

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর গান শুনেছিলাম—তাঁর পরিচয়ও পেয়েছিলাম —কিন্তু সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার কথাও আমার মনে হয় নি এবং তিনি যে ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, এ কথাও তাঁর হাবভাবে আমি বুঝতে পারিনি। কথাবার্তা হলেও না হয়, হয় তো কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু তাও তো হয় নি। আমার তখনকার স্মৃতি একটি সুন্দর-কায় আয়ত-চক্ষু সু-গায়ক নবীন যুবকেই পর্যবসিত হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ একযুগ চলে গেল। সংসার-নাট্যমঞ্চে কত নাটকের কত ভূমিকাই গ্রহণ করলাম। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই বিলীন হয়ে গেল। কত ক্ষণস্থায়ী সুখ জীবনান্ত-স্থায়ী গভীর মর্ম্ম-বেদনায় পরিণত হয়ে রইল। কত আনন্দেও সংসার গড়তে গেলাম। দেখতে দেখতে সে সকল শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। আমার জীবনের এই ১২ বৎসরের কাহিনী—কি হবে আর সে সকলের আলোচনা করে?

সংবাদপত্রাদিতে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নানা কথা পড়তে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে অনেক জ্ঞানী গুণী মনীষী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পরমহংসদেবের কৃপা অনেকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। আমিও দু' একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। কত সাধু, কত ভক্তের সমাগম দেখেছিলাম। আমি দুয়োয়ের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায় নিয়েছিলাম। কোন দিন তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল কি না সন্দেহ—কৃপা-দৃষ্টি তো মোটেই নয়।

সেই সময় শুনতে পেতাম—নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে খুব বেশী যাতায়াত করছেন। লোকের মুখে আর খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পেতাম এবং

স্মৃতি সুধায় ভরা থাক পৌষ পাবন

প্রীতি বসু

পৌষ-পার্বন—সাদা কথায় পিঠে-পুলির উৎসব কেমন করে পালিত হচ্ছে, জানবার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার আধাগ্রাম আধা শহর ঠাকুরাণীচক-এ গিয়েছিলাম। প্রথমেই অশীতিপর বৃদ্ধা রাণীবালার সাথে দেখা হোল। অল্প শীতেই কাবু হয়ে দুপুরের রোদ পোহাচ্ছিলেন দাওয়ায় বসে।—পরিচয়পর্ব শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম—পৌষ সংক্রান্তির পৌষপার্বন তো এসে গেল, কি করবেন?

চিরদিনের ঘরের গৃহস্থ বউয়ের আচরণসুলভ সলজ্জভাব এখনও যেন তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তাই তিনি স্বভাবসুলভ সঙ্কুচিতভাবে বললেন—আমরা তো বড় গরীব, কি আর করব। সামনের উঠোনের এক কোণা দেখিয়ে বললেন—ওইখানে একসময় গোলা ছিল, গোয়াল ছিল। গোয়ালে গরু-গাভীনে ভরা থাকতো। এ-সময় বাড়ীর মানুষরা নিজেরা সঙ্গে মুনিষ দিয়ে নতুন ধান গোছা-গোছা করে কেটে এনে গোলা ভরতেন। আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠতো। ভাবতাম—'সোনা এল ঘরে'।

সোনার অর্থ?

আমরা জাতে চাষী। ধানই তো আমাদের ঘরে সুখ-শান্তি-সম্পদ আনবার ভরসা ছিল, তাই আমরা ধানকেই সোনা বলতাম।

মনে পড়ে গেল সত্যই তো কাব্য-কবিতায় সাহিত্যিক-রা ধানকেই তো 'সোনার ফসল' বলে উল্লেখ করে আসছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—পৌষপার্বন কেমন ছিল?

বললেন—সেতো এক মচ্ছব যেন। আরম্ভ হোত মাস পয়লা থেকেই। পৌষ মাস পড়তে না পড়তেই নিকোনো, ধোয়া-মোছা, পোষকালি তোলা শুরু হোত। সংক্রান্তির আগে আগেই সব মিটিয়ে ফেলতাম। সংক্রান্তির দিন তো হৈ হৈ ব্যাপার—লক্ষ্মীপুজোর জোগাড়-যাগাড়, পিঠেপুলি তৈরি। একটু থেমে মৃদু হেসে বললেন, তারপর তো দেওয়া-খাওয়ার পরব।

বললাম পিঠে-পুলি সম্পর্কে বলুন।

বললেন—সংক্রান্তির আগের দিন চাল-ডাল ভিজিয়ে রাখতাম। বড় সংসার ছিল। তাই রান্নার বহরও খুব ছিল। কিন্তু সংক্রান্তির দিন সকাল সকাল বাবুদের ও ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য একহাঁড়ি ভাত, আর এককড়া চচ্চড়ি করে রেখে দিতাম। যার যখন ইচ্ছে হোত, সে তখন তাই খেত। মেয়ে-বৌরা তো পিঠের জন্য চাল-ডাল পেষা, নারকোল কুরিয়ে গুড় দিয়ে ছাঁই তৈরি করা, দুধ জ্বাল দিয়ে রাখা—এসবেই লেগে থাকতাম। পিঠে তৈরি সন্ধ্যের মধ্যেই সেরে ফেলতাম। তারপর মা-লক্ষ্মীর আসনের ঠাঁয়ে ও ঘরের চৌকাটগুলোতে আলপনা দিয়ে, চারদিকে চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে, পিদীম জ্বেলে মা-লক্ষ্মীর আহ্বান করে পুজো সেরে নিতাম। তারপরতো প্রায় সারারাতই বাড়ীর লোকজন, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-পড়শীদের মধ্যে পিঠে দেওয়া-নেওয়া-খাওয়া চলতো। পরের দিনও চলতো বাসী পিঠে দেওয়া-নেওয়া-খাওয়া। সেসব একদিন গেছে। ততক্ষণে তাঁর কলেজ পড়ুয়া নাতনী সোমা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হেসে হেসে বলল—এবারও হবে গো ঠাকুমা। মা লক্ষ্মীপুজোর জন্য কিছু না কিছু পিঠে করবেই— পায়েস পিঠে আর আস্‌কে পিঠে তো হবেই। বাবা তো কবেই ছান এনে রেখেছে। আর এখন পাটি সাপটা, দুধপুলি—এসব তো দোকানেও পাওয়া যায়। টিউশনির টাকা থেকে তুলে রেখেছি কিনে এনে দেব।

ঠাকুমা স্মৃতি রোমন্থনের আবেশেই বললেন—এসব কি আর সেই আগের মতো।

নাতনী আবার হেসে হেসে সুর করে বলল—স্মৃতিসুধায় ভরা থাক্ তোমার পৌষপাবন।

গিয়েছিলাম উত্তর ২৪ পরগণার ভিতরের প্রত্যন্ত গ্রাম ব্যাঁটরা-ট্যাটরা প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখানকার গৃহস্থ মধ্যবয়সী লক্ষ্মীবাবু

গোলা ভরা ধান — আসছে পৌষ পাবন

বললেন—পৌষ সংক্রান্তির দিন তো আমাদের খুবই আনন্দের দিন। পাশ থেকে স্ত্রী নারায়ণী বললেন—ওদিন যে আমাদের ঘরে ঘরেই পিঠের বন্যা বয়। ওদিন ভাত-ডাল বন্ধ, শুধুই পিঠে তৈরি করি।

কি কি পিঠে কর?

আসকে পিঠে আর পাটি-সাপটাই বেশী করি। ওগুলো তো চাল-ডাল-গুড় নারকেলেই হয়ে যায়। দুধপুলিটুলি বড়-বড় ঘরে হয়।

বলি কপিলার কথা—গঙ্গাসাগরের সমুদ্রের কাছাকাছি তার স্বামীর ছোট্ট চায়ের দোকান। তাতে মুড়ি, বিস্কুট, চানাচুর সবই পাওয়া যায়। সেখানেই কপিলা স্বামীকে চা করতে সাহায্য করছিল। সেখানেই চা খেতে খেতে তার সাথে আলাপ হলো। আলাপের শুরুতেই দেখলাম সে যেন কেমন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে যেতে চাইছে।

জিজ্ঞেস করলাম—যেতে চাইছো কেন; ঘরে বুঝি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আছে?

সে মুখচোরা হাসি হেসে বলল—না-না। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে। মেয়ের তো ভিন্ গায়ে বিয়ে দিয়েছি। তারই ছোট একটা ছেলে-মেয়ে। আমি ঘরে যেতে চাইছি—পৌষ সংক্রান্তি তো এসে যাচ্ছে। পৌষ মাসের কালিকুলি তো তুলতে হবে। তার মধ্যে আবার পিঠে করার সরঞ্জাম গুছোতে হবে।

তোমরা কি পিঠে করার সরঞ্জাম তৈরি করবে, না কিনবে?

এখন সমুদ্দুরের জন্য মাটি তো বালিমাটি, তা দিয়ে কোনও কিছু তৈরি করা যায় না। তবে গাঁয়ের ভিতরে ভিতরে যেখানে গাছ-গাছড়া আছে সেখানকার বালি একটু এঁটেল ধরনের, সেগুলোই ছেড়ে ঝুড়ি দিয়ে পিঠে করার সরঞ্জাম তৈরি করি।

দোকানে যে দেখলাম পিঠে করার সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে।

কপিলা বলল—ওগুলো বড়বাড়ীর লোকেরা কেনে, আর তোমাদের মতো যারা বাইরে থেকে আসে, তারাও কিনে নিয়ে যায়। আমি শাশুড়ীকে যে রকম করতে দেখেছি তাই করি। লাজুক কপিলা কিছুটা প্রগলভ হয়ে বলল—ছেলের বৌ এনে তাকেও শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কপিলার লজ্জাকে কাটিয়ে ওঠা দেখে হেসে বললাম, পৌষ সংক্রান্তির দিন কি কর?

উচ্ছ্বসিত হয়ে সে উত্তর করলো—বাবা, এদিন তো সারা দিনের মধ্যে ফুরসুত পাবার জো নেই। গাদা গাদা চাল-ডাল বাটা, নারকেল কুড়োনো, গুড় গুড়োনো, পিঠে তৈরি করা। কত যে কাজ। সন্ধ্যে হলেই নিজেরাও একটা বাটি করে চালের গুড়োনি, আর ছোটদের হাতেও ধরিয়েছি। বড়রা মা-লক্ষ্মীর কাছে গুড়ো ছড়াতে ছড়াতে শান্তি-সুখ-ঐশ্বর্য চায়। আর ছোটরা বাক্স-প্যাটরার উপর গুড়ো ছড়াতে ছড়াতে সুর করে বলে—আমাদের নতুন নতুন অনেক বাক্স-প্যাঁটরা, জিনিষ পত্র, টাকা-পয়সা হো-ক্।

তোমরা কি সব নতুন চাল দিয়ে কর?

নতুন চাল দিয়েই তো করা নিয়ম। কিন্তু এখন সারা বছরই চাষ হয়। তবে হ্যাঁ, পৌষ সংক্রান্তির আগে আগে যে ধান হয়, সেগুলোই চাল করে পুজোর কাজে লাগাই।

বড় তাড়া কপিলার, তাই তাকে আর আটকাইনি।

দেখেছিলাম মেদিনীপুর আর উড়িষ্যা যেখানে মিশে গিয়েছে সেখানকার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের—যাদের পরণে শুধুমাত্র একখানা কাপড়। বৈদ্যুতিক বাতি কাকে বলে জানে না। শুধুই ঋষিকুল্যা নদীর ন্যায় নদীগুলোর হাওয়া খাওয়া আর ধূ ধূ করা মাঠগুলো দেখে-দেখে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটানো। তারাও পৌষ সংক্রান্তিতে মেতে ওঠে পৌষপাবন পালনে।

আলাপ হয়েছিল কুঁল্লার সাথে—শুকনো পাতা-ডাল ঘাস সংগ্রহ করে আঁটি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল।

তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম—পৌষ-পাবনের আগের দিন সিদ্ধ চাল ভিজিয়ে রেখে পরের দিন তা বেটে তাতে নারকোল কুড়িয়ে দিয়ে চাপ-চাপ করে পিঠে গড়ে কড়ায় কলাপাতা দিয়ে ছেঁকে নিয়ে মিষ্টি দিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করে খায়। আগের দিনে ঘরে-ঘরে চালের গুঁড়োর আলপনা দেওয়া থেকে অনেক কিছুই হোত। এখন বেশীর ভাগ ঘরেই সেসব কিছুই হয় না। তবে যে যেমন পারে পিঠে করে আর খাওয়া। চলেই আসছে।

কথা বললাম— কলকাতার খিদিরপুরের বৌ অনিন্দিতা, ভবানীপুরের বৌ মৌমিতা ও বেহালার দীপাঞ্জনার সঙ্গে—সকলেই দেখি একই কথা বলল। বলল

(এরপর ১৩ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। মহাবলী ।। ৩

শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাক্রম

অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

গৌরচন্দ্রিকা ঃ

ষোড়শ শতকে বৃহৎবঙ্গ তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেব। অথচ তাঁর জীবনকালে কোনও জীবনচরিত লেখা হয়নি। অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত তাঁর থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির অশ্রুধারায় আচ্ছন্ন ছিল। চৈতন্যর জীবন ছিল তাঁদের কাছে ভাগবত নায়ক শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীচৈতন্যর বালকসুলভ চাপল্যকে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের চাপল্য বলেই মনে করতেন তাঁরা। এর ফলে শ্রীচৈতন্যের জীবনের পরিবর্তনগুলি কাল বিভাগকে অনুসরণ করেনি। অথচ আমরা স্থূল দৃষ্টিতেই দেখতে পাই, নিমাই থেকে শ্রীচৈতন্য হতে তাঁকে পরপর তিনটি দীক্ষা স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে এক একটি দীক্ষার পর। অন্যভাবে বলা যায়, পরিবর্তন ভূমিতে প্রবেশের আগে তাঁর দীক্ষা হয়েছে।

আরও একটি কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে তাঁকে নিয়ে যা লেখা হয়েছে, তা কেবল ভক্তি আপ্লুত পদ বা কাব্য। তাঁর তিরোধানের পর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লেখেন, চৈতন্য ভাগবত। তারও অনেক পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা হিসাবে চৈতন্য চরিতামৃতকে সম্মান দেওয়া হয়। এতে আবার যে অংশগুলি বৃন্দাবনদাস সবিস্তারে বলেছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেবলমাত্র সেগুলির উল্লেখ করেই ছেড়ে দিয়েছেন।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের জীবন, শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে এক দেখানোতেই কালক্ষেপ করেছেন বেশি। তবুও বৃন্দাবন দাসকে অনুসরণ না করলে শ্রীচৈতন্যের পরিবর্তনগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখাতে পারব না।

ব্রাহ্মীদীক্ষা ঃ

শ্রীহট্ট থেকে আগত নবদ্বীপ নিবাসী জগন্নাথ মিশ্র ও শচীর নন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ। গোরা, গোরাচাঁদ, নিমাই প্রভৃতি অনেক নাম তাঁর। পোষাকী নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র, দাদা বিশ্বরূপ অল্পবয়সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ বাল্যকাল থেকেই বেশি আদরে এবং স্বভাব চাপল্যে প্রতিবেশীদের উত্যক্ত করতেন। দুরন্তপনার নানা বিবরণ তখনকার অনেক পদেও বর্তমান। কিন্তু বৃন্দাবন দাস মনে করেন—

পুরবে শুনিল যেন নন্দের কুমার,
সেই মতো সব করে নিমাই তোমার।।

সমসাময়িক পদকর্তারাও একই রকম ভাবতেন।

তাঁর দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত সাধারণ মানুষ। কারও 'গায় ধুলা দেয়' কারও চুলে দেয় 'ওকড়ার বীজ'। বালিকা এমনকি যুবতীরাও শচী মায়ের কাছে ছেলের নামে অভিযাগ আনেন।

বৈদিক শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্র, অতএব নবম বর্ষেই ব্রাহ্মী দীক্ষা হলো শ্রীগৌরাঙ্গের। উপনয়নের পবিত্র কৃত্যের মধ্যে পিতা জগন্নাথ স্বয়ং ব্রহ্ম গায়ত্রী শ্রীগৌরাঙ্গের কানে দিলেন। ভক্তের দৃষ্টিতে যজ্ঞসূত্রধর নিমাই হলেন বামন অবতার। জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিয়ে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁর হাতে তুলে দিলেন। বালককালের চাপল্য পরিহার করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। বাল্যের চাপল্যের পরিবর্তে দেখা দিল বৈদগ্ধ চপলতা। সহপাঠী ছাড়াও বয়সে বড় এমনকী যশস্বী পণ্ডিতদেরও শাস্ত্রানুসারী যুক্তি তর্কে নাজেহাল করে তুললেন। গায়ত্রী মন্ত্রে দেবতাদের বরণীয় যে 'ধী'-তার স্থূল রূপটিই এখন শ্রীগৌরাঙ্গের চপলতায়। অধ্যয়ন শেষের সময় সময়ই জগন্নাথ মিশ্র গত হলেন। নিজেই টোল খুললেন নবদ্বীপে। বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধি মত্তার অপূর্ব মিশ্রণে খ্যাতনামা হয়ে উঠলেন তিনি। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। বহু শিষ্য সহ পূর্ববঙ্গ বিজয়ে গেছেন। সর্বত্রই তিনি জয়ী। ফিরে এসে শুনলেন লক্ষ্মী গত হয়েছেন। কিছুদিন পরে শচীমাতার অনুরোধে যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করলেন, তাঁর সব রকমের চাপল্য যেন কোথায় চলে গেল। পিতার পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় গেলেন। সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে গৌরাঙ্গের ভাবান্তরের সূচনা হল। গয়ার ব্রাহ্মণদের মুখে পাদপদ্ম মহিমা শুনতে শুনতে তিনি আরও স্থির গম্ভীর, পরে যাঁর পাদপদ্ম তাঁকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হলেন।

নামদীক্ষা ঃ

বৃন্দাবন দাস গয়ায় বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন প্রসঙ্গে চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

সর্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ।।

দর্শন করতে করতেই শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দূরে থেকে দেখছিলেন ঈশ্বরপুরী। যিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, তাঁর

সঙ্গ লাভে ও আশীর্বাদে ঈশ্বরপুরী প্রেমভক্তির একনিষ্ঠ সাধক। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সামনে এসে তাঁকে ধরলেন। চেতনা প্রাপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে দেখেই বললেন—

সংসার সমুদ্র হতে উদ্ধারো আমারে।

ভক্ত, পদকর্তা সকলেই যেমন শ্রীচৈতন্যকে বাল্যকাল থেকেই শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখতেন, ঈশ্বরপুরীও তা থেকে বাদ যাননি। তিনি বলেছেন—

সত্য এই কহি ইথে কিছু অন্য নাই।
কৃষ্ণদরশন সুখ তোমা দেখি পাই।।

অথচ ব্রাহ্মী দীক্ষার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিমাই, নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীকে দেখে উপহাস করেছেন। বৈদ্যবংশে জাত ঈশ্বরপুরীর বংশবৃত্তি নিয়েও উপহাস করতে ছাড়েননি। সেই ঈশ্বরপুরীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন, পণ্ডিত নিমাই। ঈশ্বরপুরীও তাঁকে দশাক্ষরী গোপালমন্ত্র দান করেছেন। যার মূল শব্দ হল 'গোপীজন বল্লভে'। আমরা দেখতে পাই শ্রীগৌরাঙ্গ এর পর থেকেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। শ্রীরাধার পূর্বরাগের সমস্ত চিত্রগুলি গৌরাঙ্গের দেহে ফুটে উঠল।

এ যেন সেই চোখে না দেখে, কেমন বাঁশী শুনেই উন্মত্ত হওয়া। নাম দীক্ষার বেলাতেও ভক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরপুরীর মনুষ্য শরীর স্বীকার করেননি। তবে তার স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ'-স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে গৌরাঙ্গ কে নাম দীক্ষা দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাস দীক্ষা

নামদীক্ষার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ এমন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন যে, আপন জননী, পত্নী, জন্মভূমি নবদ্বীপ সব ভুলে মথুরা যেতে চাইলেন। ঈশ্বরপুরীর নির্দেশ এবং সঙ্গী সাথীদের অনুরোধে তিনি ফিরে এলেন নবদ্বীপে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে।

পরম রিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ।।

ভক্তেরা তাঁর উপর যতই দেবত্ব আরোপ করুন না কেন শ্রীগৌরাঙ্গ কখনও লোকাচার শাস্ত্রাচার লঙঘন করেননি। নবদ্বীপে নাম সংকীর্তন প্রচার করলেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলন, জগাই মাধাই উদ্ধার এবং কাজীদলনের পর সন্ন্যাসের জন্য ব্যাকুল হলেন। অবৈষ্ণবদের নাম সংকীর্তনে প্রবল বিরোধিতা তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। হরিনামের যত শক্তি থাক-জীবকে উদ্ধার করতে সন্ন্যাস নিতে হবে। কারণ সন্ন্যাসী ছাড়া সাধারণ মানুষ অন্য কারও কাছে ধর্ম কথা শুনতে চায় না।

মানুষকে উদ্ধার করার ব্রত নিলে সন্ন্যাস দীক্ষা নিতে হবে, ভারতীয় ধর্মগুরুদের এটাই চিরন্তন আদর্শ। এখন যারা নামশক্তি মানতে চাইছেনা, সন্ন্যাস নিলে তারাই প্রণাম করবে। এই সংকল্প নিয়ে তিনি কেশব ভারতীর কাছে যান। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত কেশব ভারতী ভাবেন—

কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী...
.....
ভার্যা বা জননী প্রাণ রহিব কি মতে?

এসব চিন্তা করেই তিনি জননী ও ভার্যার অনুমতি চাইতে পাঠালেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নানা ভাবে জননী ও ভার্যার অনুমতি আদায় করলেন। সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করে আবার কেশব ভারতীর কাছে গিয়ে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। অগত্যা কেশব ভারতী সন্ন্যাসের সমূহ কৃত্য করিয়ে দীক্ষা দিলেন। তখন থেকে তাঁর নাম হল— শ্রীচৈতন্য। ভক্তের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য যেন নিজেই নিজের দীক্ষা নিলেন—

প্রভু বোলে স্বপ্নে যেন কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিলা কথন।।

সেই মন্ত্রই শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর কানে কানে বলে দিলেন। কেশব ভারতী সেই মন্ত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গকে দীক্ষা দিলেন। আর ভক্তেরা বললেন—

'ছলে প্রভুকৃপা করি তারে শিষ্য কৈল'।

ভক্তের কাছে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। তিনি স্বয়ং শ্রীহরি, তিনি পূর্ণ, তিনি অচ্যুত। তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা মানুষের নাই। কেবল লোকাচার ও শাস্ত্রীয় বিধান মানতে তাঁকে দীক্ষা কৃত্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এরপর থেকে তাঁর জীবন কেটেছে পরিব্রাজনে আর নীলাচলে। হরিনাম তাঁর মুখে। যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁরা সবাই হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে স্বর্গ সুধা পান করেছেন। এ ভাবেই কেটেছে সন্ন্যাস পরবর্তী চবিবশ বছরের বিস্তৃত জীবন।

পৌষ পাবন

(১২ পাতার পর)

পৌষ সংক্রান্তির দিন? হ্যাঁ-হ্যাঁ পৌষ মাসের শেষে দিন তো। অবশ্যই লক্ষ্মীপুজো করি, পিঠে-পায়েসও তৈরি করি। মা তো বলেই, আর আমাদের নিজেদের হিন্দু-ঐতিহ্য যেগুলো; সেগুলো পালন করতে আমার খু-ব ভালো লাগে।

সবশেষে বলি—আজকের বিশ্বায়ণের যুগে সবাই যেন ঐতিহ্য দেখাতেই পালনে তৎপর। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পালনের মধ্যে না থাকে বিনম্রতা, না থাকে আন্তরিকতা, না সৌন্দর্য। শুধুই যেন দেখন হাসি। তাই তো প্রতিবেদনের প্রথম দিকের নাতনী সোমার রেশ ধরেই বলি—স্মৃতি-সুধায় ভরা থাক্ পৌষপার্বন।

বিবেকানন্দের স্মৃতি-তর্পণ

(১১ পাতার পর)

এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করিনি। স্বামিজী তন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেননি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাস্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোকসভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখ মাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির দর্পণ প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না।

(জলধর সেন (১৮৬১—১৯৩৯) প্রখ্যাত লেখক, সম্পাদক। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জনপ্রিয় সম্পাদক। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিমালয়'। জলধর সেনের বর্তমান স্মৃতিচারণ একটি বিতর্কিত রচনা। বিবেকানন্দের প্রাণদানের কাহিনীটি সে যুগে অত্যন্ত বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। এই লেখাটি প্রথম 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন তৎকালীন আর এক জনপ্রিয় লেখক দীনেন্দ্র কুমার রায় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়।)

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার

গঙ্গাসাগর মেলা

নবকুমার ভট্টাচার্য।। হিন্দুদের ঐহিক মুক্তিতীর্থ গঙ্গাসাগরের প্রবর্তন করেছিলেন ইক্ষাকু বংশের রাজারা। পৃথিবীর সব থেকে বড় ব-দ্বীপে সেই থেকেই যেন একটা ঐশ্বরিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। একদিকে পতিতপাবনী গঙ্গার সঙ্গতি, অন্যদিকে মহাত্মা কপিল মুনির অধিষ্ঠান গঙ্গাসাগরের মহিমাকে পূর্ণ বিকশিত করেছে এই সহাবস্থান। ভগিনী নিবেদিতা গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গে বলেছেন, ''গঙ্গাসাগর মেলা জনচিত্তের একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, পুণ্যলাভের সংস্কার এক্ষেত্রে গৌণপ্রেরণা। তীর্থযাত্রীরা এই মহামেলায় সমবেত হয়ে একটি প্রত্যক্ষ আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করে।''

প্রচলিত কাহিনী অনুসারে সাংখ্যাচার্য কপিল তপস্যা করতে এসেছিলেন পাতালতীর্থ সাগরসঙ্গমে। অযোধ্যার রাজা দশরথের পূর্বপুরুষ রাজা সগর সেইসময় অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য একটি সুদর্শন ঘোড়া ছেড়ে দেন। ঘোড়াকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর ৬০ হাজার পুত্রকে নিযুক্ত করেন। এদিকে স্বর্গের রাজ্য হারাবার আশঙ্কায় দেবরাজ ইন্দ্র ওই ঘোড়া চুরি করেন। সেই ঘোড়াকে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমের পিছনে বেঁধে রেখে দেন। পরে সগর রাজার পুত্রেরা ওই ঘোড়ার খোঁজ পান। তখন তারা নানাভাবে তিরস্কৃত করেন ঋষি কপিলকে। এতে কপিল মুনির রোষানলে সগরের ৬০ হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরে সগরের বংশধর ভগীরথ দীর্ঘ তপস্যার ফলে মহর্ষি কপিলকে খুশি করতে সমর্থ হন। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। গঙ্গার পুণ্য সলিল স্পর্শে ভস্মীভূত সগর পুত্রেরা মকর সংক্রান্তির দিন উদ্ধার লাভ করে স্বর্গারোহণ করেন। তাই ধর্মপ্রাণ মুক্তিকামী মানুষের মনে বিশ্বাস, মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে সাগরসঙ্গমে স্নান করলে সর্ব পাপ দূর হয়। তাই অনাদিকাল থেকে আজও মানুষ ছুটে যায় শান্তি পুণ্য এবং মোক্ষের আশায়। রামায়ণ, মহাভারতের যুগ থেকে ঋষি বশিষ্ঠ, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, গৌতম মুনি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমাররা পর্যন্ত ছুটে গেছেন সাগরসঙ্গমে। মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায় স্বয়ং যুধিষ্ঠির সাগর- সঙ্গমে এসেছিলেন। মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙের বিবরণেও গঙ্গাসাগর স্থান পেয়েছে। মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও সাগরতীর্থ সম্পর্কে নানা কথা রয়েছে। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রয়েছে গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গ।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন সেকালের সাগরদ্বীপকে স্মরণে রেখে। একসময় প্রথম সন্তান গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেক চেষ্টার পর ১৮০২ সালে লর্ড ওয়েলেসলি আইন করে এই ধর্মান্ধ প্রথাটিকে রদ করে দেন।

১৭২৭ সালের আলেকজেণ্ডার হ্যামিলটনের বিবরণ থেকে জানা যায়, সাগরদ্বীপ হিন্দুদের কাছে খুবই পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতিবছর শীতে বহু সাধু ও তীর্থযাত্রী এখানে স্নান করেন ও পুজো দেন। ১৮৬২ সালে গঙ্গাসাগর মেলা প্রসঙ্গে উইলসন সাহেব এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁর লেখার বর্ণনা অনুযায়ী, সেই সময় কপিলমুনির মন্দিরের সামনে ছিল একটি বট গাছ। এই গাছের নিচে ছিল রাম ও হনুমানের মূর্তি। মন্দিরের সংলগ্ন ছিল মহর্ষি কপিলের মূর্তি। মন্দিরের পিছনে সীতাকুণ্ড। যদিও সেসব কবে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে। ১৯৭৩ সালে বর্তমান মন্দিরটি স্থাপিত হয়। দেখাশোনার মূল দায়িত্বে রয়েছেন অযোধ্যার নির্বানি আখড়া। কথিত রয়েছে, মেদিনীপুরের এক রাজা যদুরাম কিছু পশ্চিমী ব্রাহ্মণকে সাগরদ্বীপে এনে মন্দির দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন।

তাঁদের ভরণপোষণ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্বও নেন। যেহেতু রাজা সগর, ভগীরথ এরা সকলেই সূর্যবংশের রাজা ছিলেন; সূর্য বংশের কুল পুরোহিতদের পরবর্তী প্রজন্ম অযোধ্যার হনুমানগড়ির মহন্ত সীতারাম দাসকেই রাজা যদুরাম নাকি পুরোহিত নিযুক্ত করেন।

গঙ্গাসাগরকে নিয়ে প্রচলিত আছে এক বিখ্যাত প্রবাদ 'সব তীর্থ বারবার কিন্তু গঙ্গাসাগর একবার।' তখন সাগর যাত্রা সমস্যা বহুল কষ্টকর হলেও বর্তমানে সাগরযাত্রা অনেক সহজগম্য হয়েছে। তাই প্রতি বছরই বাড়ছে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা। তবে সাগর মেলায় উত্তরপ্রদেশ আর বিহার থেকে বেশির ভাগ তীর্থযাত্রী আসেন। প্রাচীনতা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাগরমেলার অবস্থান কুম্ভমেলার পরেই।

যাত্রাপথে বাবুঘাটে সাধুসঙ্গ

বাসুদেব পাল।। স্থান বাবুঘাট। একজন দেখতে যুবকের মতো ব্রহ্মচারীকে ঘিরে একটা জটলা। মধ্যবয়স্ক কয়েকজন ঘিরে রয়েছেন। তাদের কয়েকজন বসে, কয়েকজন দাঁড়িয়ে। কথাবার্তা নানারকম হচ্ছে। রীতিমতো আড্ডা জমে উঠেছে। হঠাৎ ওই ব্রহ্মচারী ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন—কলকাতা শহর কে বসিয়েছে জানো? একজন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল—জোব চার্নক। যুবা ব্রহ্মচারী নস্যাৎ করে বললেন —বাবা কপিলমুনিই কলকাতা বসিয়েছেন। তোমরা জানো না।

মুহূর্তে মনের মধ্যে আলোড়ন। সত্যিই তো যুগ যুগ ধরে কপিলমুনি মন্দির সাগরসঙ্গমে গঙ্গাসাগরে বিরাজ করছে। আর লক্ষ লক্ষ ভক্ত জলপথে বা স্থলপথে প্রতিবছর কলকাতার উপর দিয়ে আসছেন যাচ্ছেন। তাহলে আসলে কলকাতা ছিলই, জোব চার্নক জায়গাটার ইজারা নিয়ে নতুনভাবে পত্তন করেছেন মাত্র।

কালের নিয়মে কিছু ধ্বংস হয় কিছু গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বাবুঘাট থেকে একটু এগিয়ে মিলেনিয়াম পার্ক ছাড়িয়ে মোহনবাগান মাঠের পিছনে কলকাতা ময়দানের এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ এলাকা খোলা মাঠ। এখনও (৪ জানুয়ারি, ২০১০) গঙ্গাসাগর যাত্রীরা সকলে পৌঁছায়নি। সবে আসতে শুরু করেছেন। ভিন্‌রাজ্য থেকে কয়েকটা বাসে তীর্থযাত্রীরা এসেছেন। অনেকেই এসে পৌঁছাননি। সবতীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার। না একবার নয়, কিছু মানুষ তো বার বারই আসেন। যেমন, বাইকবাবা। না এবার উনি বাইকবাবা নন। গাড়ি বাবা। গাড়ি করে এসেছেন দু'জন কন্যাকুমারী থেকে। খোলা লাল রং-এর গাড়ি। চালকের নাম 'রাজু'। সেই চালিয়ে এনেছে। কলকাতায় পৌঁছেছেন ৩১ ডিসেম্বর। যাবেন কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত। বছরে মাস দু'য়েক কাটান কন্যাকুমারীতে।

বাকী সময়টা রাস্তাতেই। ইতস্তত, ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী। ২/৪ জন মিলে বড় গাছের টুকরো জ্বালিয়ে প্রায় আদুড়গায়ে বসে আছেন। এদিকে তাঁবু খাটানোর কাজ চলছে। তবে এঁরা সবাই হিন্দু তীর্থযাত্রী কিনা। হজে তো যাচ্ছেন না। সেজন্য মধ্যে একটু যেন অপরাধবোধ। বললেন, আপনি কী লিখে দেবেন! জিজ্ঞাসায় জানা গেল কাছেই চাঁদনী চক-এর বাসিন্দা, চাঁদনী চক বাজার থেকে তৈরি ব্যাগ এনে মেলায় মেলায় ফেরি করে বিক্রী করেন।

দু'দিন আগেই ধর্মতলায়

প্রায় কোনও ব্যবস্থা চোখে পড়লো না। যেসব ব্যবস্থা হচ্ছে তার প্রায় সবটাই বেসরকারি উদ্যোগে। নেই কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা। মিলেনিয়াম পার্কের ট্রাফিক মোড়ে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মী প্রশ্ন করলেন—আমরা দু'টাকা নিলে ছবি হয়, আর যারা আমাদের উপেক্ষা করে ট্রাফিক নিয়ম ভেঙে পারাপার করেন তাদের বেলায়? তাঁকে বললাম, ওটাও হয়। আপনার হয়তো চোখে পড়েনি। এর মধ্যেই হরেকরকম ফেরিওয়ালা। কেউ চা, কেউ পান, বিড়ি, জর্দা, বাদাম বেচছে। তবে চোখে পড়ল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যাগ-বিক্রেতাদের। একজন গুছিয়ে বসে। দু'তিন জন দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করাতে নাম বলতে চান না। হৃদ্যতার চেষ্টায় নাম বললেন—এম ডি রহমান। মনের মিউজিয়ামের সামনে লাহারের গাড়ি পাওয়া গিয়েছে। দীর্ঘসময় রাস্তায় পড়েছিল। তারপর নিরাপত্তা প্রহরীদের নজরে আসে। সেজন্য মেলা, বিশেষ করে গঙ্গাসাগর মেলা যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হন, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনও অবধি কোনও রকম সতর্কতা ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। এখনও বোঝা যাচ্ছে না তীর্থকর আর যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি (কেবলমাত্র মেলার সময়ে) নিয়ে বাম সরকার ও তৃণমূল পঞ্চায়েতের দ্বন্দ্বটা এখন কোথায়? ফেরার পথে ৭৮/১ বাসে দু'জন কন্ডাকটর পরস্পর বলাবলি করছে—মেলায় যাত্রী নিয়ে গেলে ইচ্ছামতো ভাড়া নেওয়া যায়।

মকরসংক্রান্তি উৎসব

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আবর্তিত হয় ছয় ঋতু সমন্বিত বার্ষিক কাল চক্র। উৎসব মুখরিত শরতের পর বিষণ্ণ হেমন্ত পার হয়ে আসে হিমজড়িত শীতঋতু। এরই প্রথম মাস হল পৌষ। পৌষ মাসের শেষ দিন—পৌষ সংক্রান্তি। মকর সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, তিল সংক্রান্তি প্রভৃতি নামেও এই দিনটি হিন্দু সমাজে পরিচিত।

শিল্পায়ণ, নগরায়ণ, বিশ্বায়ণ—বিবিধ আধুনিক আয়নে'র ঠেলায় ঋতুভিত্তিক প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন আজকাল সহজে বোঝা যায় না। শরতে শুরু পাতা ঝরানোর বেলা। ধীরে ধীরে পত্রহীন হতে থাকে গাছ-গাছালি। প্রকৃতি ক্রমশ নিঃস্ব রিক্ত রূপ নেয়। প্রকৃতির এই রিক্ততা মানব মনেও প্রভাব ফেলে। মন সজীবতা হারায়। মনে আসে শিথিলতা, জড়তা। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্বন্ধ খুবই নিবিড়, বিশেষত আমাদের দেশে। যে কারণে আমাদের দেশের বিভিন্ন উৎসব পালিত হয় প্রকৃতির সাথে সাযুজ্য রেখে। প্রকৃতির রিক্ত রূপ যেমন আমাদের মনমরা করে তেমনি তার প্রাণবন্ত উপস্থিতি আমাদের উজ্জীবিত করে। এই উজ্জীবনের বার্তা বয়ে আনে মকর সংক্রান্তি। প্রকৃতি নিঃস্ব, রিক্তভাব কাটিয়ে নবরূপে প্রতিভাত হতে থাকে আমাদের শরীর, মন, চিন্তা এক নতুন আশ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। অন্ধকার রাত্রির মেয়াদ ক্রমশ কমতে থাকে, বাড়তে থাকে। আলোকিত দিনের মেয়াদ। জীবজগতে প্রাণের সাড়া পড়ে যায়।

মকর সংক্রান্তি উৎসব হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশেষ গুরুত্ব এবং উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। অন্যান্য হিন্দু উৎসবগুলির মতো এই উৎসবেরও প্রাচীনতা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। এই দিন সূর্যদেব মকর রাশিতে প্রবেশ করেন। বিশ্বচরাচরে শুরু হয় নব প্রাণের চাঞ্চ ল্য। হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ বর্ষব্যাপী সূর্য্যের গতিপথকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শ্রাবণ থেকে পৌষ অবধি সূর্যের গমনকে বলা হয় দক্ষিণায়ণ এবং মাঘ থেকে আষাঢ় পর্য্যন্ত গমনকে বলা হয় উত্তরায়ণ। পৌষ মাসের শেষ দিনে সূর্যদেব মকর রাশিতে সংক্রমিত হন। তাই পৌষ সংক্রান্তির অপর নাম মকর সংক্রান্তি—উত্তরায়ণের প্রারম্ভ সুতরাং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি।

শাস্ত্র (গীতা, উপনিষদ) মতে উত্তরায়ণ হল দেবযান পথ এবং দক্ষিণায়ণ হলো পিতৃযান পথ। উত্তরায়ণকালে মৃত্যু হলে ঘটে অনাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি এবং দক্ষিণায়নের সময় মৃত্যু হলে ঘটে পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম। উল্লেখ্য, পিতামহ ভীষ্ম উত্তরায়ণের কালকেই বেছে নিয়েছিলেন দেহত্যাগের জন্য, যাতে পুনর্জন্ম না হয়। হিন্দুশাস্ত্রে সূর্যের এই দ্বিবিধ-গমন পথের তাৎপর্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সম্পদ।

এইদিনের একটি বিশেষ হিন্দুকৃত্য হ'ল গঙ্গাসাগরে স্নান করা। সারা ভারত থেকে এইদিন হাজার হাজার সাধুসন্ত সহ কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী সমবেত হন গঙ্গানদী ও সাগরের সংগম স্থলে স্নানের জন্য। হিন্দুর চরম ও পরম কাম্য হল মুক্তি। মানুষ চায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ পরিবৃত জন্মচক্র থেকে চিরমুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্বাণ। পরম্পরাগত কারণে হিন্দুরা স্বভাবতই মোক্ষকামী। তাই সুদূর অতীতকাল থেকে প্রতিবছর বিশাল "পুণ্যলোভাতুর" স্নানার্থী জনতা উপস্থিত হয় সাগরদ্বীপে প্রবল শীত, পথের ক্লান্তি এবং অন্যান্য অসুবিধা অগ্রাহ্য করে। এই উপলক্ষে সাগরদ্বীপ একটি ছোট্ট ভারতের রূপ নেয়।

অধ্যাত্মদর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তাৎপর্য ছাড়াও মকর সংক্রান্তির একটা সুপ্রাচীন সামাজিক ভূমিকা আছে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য, সহযোগিতা এবং সমরসতার বন্ধন শক্তিশালী করার প্রতীক রূপে তিলের নাড়ু বিতরণ করা হয়। গ্রামবাংলার বাতাস আমোদিত হয় পিঠা-পায়েসের সৌরভে। প্রতিবেশীগণ একে অন্যকে আপ্যায়িত করেন নতুন গুড়ের তৈরী বিভিন্ন ভোজ্য দিয়ে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলি আমাদের সমাজের প্রত্যন্তবাসীদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, অর্থ সংগ্রহ করে সামাজিক দায়বদ্ধ তার পরিচয় দেন যাতে এই উৎসব সর্বব্যাপী, সর্বস্পর্শী হয়। অর্থাৎ সামাজিক একাত্মতা নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এই উৎসব এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শান্তির ললিত ধারা— হরিনাম সংকীর্তন

(৯ পাতার পর)

হ-তে শ্যামলা সখী নাভিতে থাকয়।
রে-তে মধুমতী নাভিমধ্যে রয়।।
হ-তে ধন্যা সখী করাঙ্গুলি রয়।
রে-তে মঙ্গলা কর অধোমুখী হয়।।

সখাগণ

হ-তে শ্রীদাম সখা জঙঘায় থাকয়।
রে-তে সুদাম সখা জানু নিবসয়।।
রা-তে বসুদাম সখা থাকে ভুরু অঙ্গে।
ম-তে অর্জুন সখা সদা থাকে লিঙ্গে।।
হ-তে সুবল সখা দক্ষিণ পদেতে।
রে-তে কিঙ্কিনী সখা আছয়ে বামেতে।।
রা-তে চাতক সখা পূর্বে নিবসয়।
ম-তে মধুমঙ্গল অগ্নিকোণে রয়।।
রা-তে শুক সখা থাকয়ে দক্ষিণে।
ম-তে বিশাল সখা রয় নৈঋত কোণে।।
রা-তে মহাবল সখা পশ্চি মে থাকয়।
ম-তে বৃষভ সখা বায়ুকোণে রয়।।
হ-তে দেবপ্রস্থ সখা উত্তরেতে।
রে-তে উদ্ধ ব সখা আছে ঈশানেতে।।
হ-তে মহাবাহু ঊর্দ্ধে রয় সুখে।
রে-তে ঈশান সখা আছে অধোমুখে।।

ফলাফল—

"এই তো কহিনু ষোল বত্রিশ পরিচয়।
যেই জন জানে ইহা ভবত্রাণ হয়।।

শ্রীহরিনাম দীপিকা গ্রন্থে রয়েছে—

"রাধামাধবঃ পাতু গোপীজন প্রিয়।
ইতি ষোড়শ নামানি দ্বাত্রাংশ দক্ষরাণি চ।।"

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর রাধামাধব সর্বাঙ্গে গোপীজন প্রিয়।

হরিনাম সংকীর্তন

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

'কলহ প্রবঞ্চ নার যুগ এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম সমূহ কীর্তন করাই হলো মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। এছাড়া কোনও পথ নাই, কোনও পথ নাই, আর কোনও পথ নাই।' (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবতের ২৩ অধ্যায়ে আছে—

"প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-গুণ নাম বই না বলহ আর।।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপবাসীদের 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রটি বলার পর বলেছিলেন—

'ইহা হইতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর।।'

শুধু নবদ্বীপে নয়, ভারত-পরিক্রমায় হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে মহামন্ত্রটিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—

"হরে-কৃষ্ণ-রাম....
তিন নামে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
বৃত্তি করি কৈলা গৌর জগতে প্রচার।।
নাম রূপে প্রেম দিলা আপনি যাচিয়া।
নামে মত্ত ভক্ত চিত্ত বেড়ায় নাচিয়া।।
করুণার কল্পতরু এই হরিনাম।
কামনায় হবে মুক্তি প্রেম ব্রজধাম।।"

চৈতন্যদেব ভক্ত শিষ্যদের হরিনাম সংকীর্তনের কথা বলেছেন, এমন কী নিজেও হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠেছিলেন। আবার কোনও কোনও পদকর্তার রচনায় দেখা যায় তাঁকে নিয়েও হরিনাম সংকীর্তন।

"(ভজ) শ্রীকষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।।"

হরিনাম সংকীর্তন অর্থাৎ শ্রীহরির নাম-কীর্তন বা তাঁর গুণ-কীর্তন করা। ভক্ত শিষ্যগণের মতে শ্রীহরির প্রচ্ছন্নে তো তিনিই অর্থাৎ চৈতন্যদেব। হরিনাম বাসরে যেমন রাধাকৃষ্ণের কীর্তন গাওয়া হয় তেমন চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দের নামকীর্তন করা হয়। এই হরিনামের মধ্যে অক্ষরগত তত্ত্ব কী আছে দেখা যাক।

"হ-হতে করয়ে হরণ শোক তাপ আদি।
রি-রিতে রিপুগণে নাশে নিরবধি।।
না-নাতে করয়ে নাশ কালিমা রাশি।
ম-মতে মঙ্গল হয় লবে 'তত্ত্বমসি'।।
এ হেন হরির নাম করে যেই জন।
সর্ব পাপ মুক্ত হয় বেদের বচন।।"

চার অক্ষরের হরিনাম শব্দটির মধ্যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে। জীব তো আর জড়বস্তু নয়। তার প্রাণ রয়েছে। কর্মের সঙ্গে বিভিন্ন জৈবিক প্রবৃত্তি রয়েছে। প্রবৃত্তিগুলি ভালো মন্দের মিশেল। ব্যক্তি তথা সমাজে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব যাতে না পড়ে তার জন্য সচেতন করা। সুপ্রবৃত্তি অর্জন বা অনুশীলন করলেই পরমার্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্থাৎ শান্তিলাভ করা যায়। মানুষ যতই ভোগবাদী হোক না কেন, প্রতিটি মানুষ শান্তি চান। শান্তিই কাম্য। পরমার্থই হলো শান্তি—যাকে শাস্ত্রীয় বচনে ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা বলা

হয়েছে।

'হরিনাম' মানবসমাজের প্রতি সচেতনতার যেমন ইঙ্গিত তেমন এটি মানবতাবাদের একটি শিক্ষা তথা মহৌষধ। বাস্তববাদী মানবতাবাদী চৈতন্যদেব তৎকালীন সময়কার পণ্ডিতদের এক হাত নিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রথাগুলির বিরুদ্ধে ছিলেন। একটি ঘটনা।

সুলতান হোসেন শাহ্ তাঁর পূর্ব প্রভু সুবুদ্ধি রায়ের মুখে 'করোয়ার পানি' ঢেলে দিয়ে হিন্দুত্ব নাশ করেছিলেন। নিরুপায় সুবুদ্ধি রায়। জাতটা চলে গেল!

পণ্ডিতরা প্রায়শ্চি ত্তের বিধান দিলেন—গরম ঘি পান করে প্রাণত্যাগ করতে হবে। এই বিধান তো একপ্রকার আত্মহত্যার করারই বিধান। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুবুদ্ধি রায় বাঁচার তাগিদে ছুটলেন চৈতন্যদেবের কাছে। চৈতন্যদেব সব শুনে চিন্তিত। প্রায়শ্চি ত্তের এই বিধান! এই বিধান মানবসমাজের মঙ্গল করে? পণ্ডিতদের প্রতি স্পর্দ্ধা দেখিয়ে তিনিও বিধান দিলেন—'বৃন্দাবনে গিয়ে হরিনাম ও কৃষ্ণ-ভজন কর।' 'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন' (চ.চ. মধ্য-২৫)। সুবুদ্ধি রায় তাই করলেন। হরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন বৃন্দাবনে।...

লালন কী জাতের মানুষ? হিন্দু না মুসলমান? জাতের টানা পোড়েনে লালন ফকিরের জীবন অতিষ্ঠ। লালন স্বয়ং বললেন—'জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।' চৈতন্যদেব লালন ফকিররা একটিই জাতির কথা ভাবতেন। ধর্ম বলতে প্রেম-ধর্মের কথাই ভাবতেন। চৈতন্যদেবের মতো লালন ফকির সবধর্মের মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিস্থ হওয়ার সময় হরিনাম সংকীর্তন করা হয়েছিল। ১৮৯০ সালের ৩১ অক্টোবর "হিতকরী" পত্রিকায় প্রকাশিত।...(মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য/প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী/যতমত তত পথ/ওভারল্যাণ্ড/১৪।২।১৯৯৩)

বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্যদেব

রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি যেমন শ্রান্তি, বিষাদ দূর করে মনকে সজীব করে তোলে তেমনি 'হরিনাম সংকীর্তন' শ্রান্তক্লান্ত মানুষকে ঈশ্বর প্রেমে ভাবাবিষ্ট করে তোলে—মনের প্রশান্তি এনে দেয়। রামকৃষ্ণদেব হরিনাম সংকীর্তন শুনে অ্যাতো আবিষ্ট হয়ে যেতেন, মাঝে মাঝে চৈতন্যদেবের মতো বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। নাম-সংকীর্তনের এমনিই মাহাত্ম্য। ভারতে হরিনাম বা হরিনাম সংকীর্তন আজ সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।...

হরিনাম সংকীর্তনের আবশ্যিক অঙ্গ হলো 'হরির লুট' নামক একটি নান্দনিক অনুষ্ঠান। নান্দনিক অনুষ্ঠানের পদটি দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ।

"নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে, আয় হরি লুট লুটে নেরে...

হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন গৌরচন্দ্র, হাটের মুন্সিয়ানা দিলেন অদ্বৈতেরে, হরিদাস ভাণ্ডারি হয়ে লুট বিলোচ্ছেন শহরে।..."

লুটের সামগ্রী হলো ফলমূল বাতাসা। ভক্তজন তা ভক্তিভরে মুখে পোরেন। লুটের পদটির ভাবের আস্বাদন তাঁদের কাছে অধরা হলেও প্রাপ্তির ঘরে জমা করেন একটি শব্দ—তাহলো ভক্তি। পসরার লুটের সামগ্রী হলো—কৃপা। ভক্তি সহকারে মহাপ্রভুর কৃপালাভ। তাত্ত্বিকের কাছে লুটের পদটি পেয়েছে অন্যমাত্রা। প্রেম, ভক্তি, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হলেন চৈতন্যদেব। উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান—সকলের ভেদাভেদ ভুলিয়ে মানবতার প্ল্যাটফরমে উপস্থিত করিয়েছেন চৈতন্যদেব। তাঁর প্রেমধর্মের ছত্রতলে একত্রিত সবাই।

'রূপ সনাতন দু'ভাই আসি, প্রেমের বাজের বসি
তারা আনন্দেতে বেচাকেনা করে...
অমূল্যধন হয় বিতরণ, মূল্য দিতে কে পারে?"

চৈতন্যদেবের হরিনাম-আশ্রিত প্রেম ধর্ম আজও অম্লান, বিশ্বের দিকে দিকে প্রবহমান।

তথ্য সহায়তা ঃ 'কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা— ভক্তিবিকাশ স্বামী/ইসকন/মায়াপুর। কৃষ্ণভক্তি রসামৃত, জ্ঞানামৃত রস, তত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জুরী—শ্রীশ্রীচরণ দাস। শ্রীচৈতন্য ও সামাজিক বিস্ফোরণ—অতুল সুর/বর্তমান সাপ্তাহিকী/ ৩০।৩। ১৯৮৬। মানবমঙ্গলে শ্রীচৈতন্য-কানন বিহারী গোস্বামী/বর্তমান সাপ্তাহিকী/৩০।৩।১৯৮৬। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর মানবতাবাদ/প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী/যত মত তত পথ/- ওভারল্যাণ্ড-১৪।২।১৯৯৩। হরি হরি বলে গোরা-(ভক্তিগীতি)--সংকর্ষণ মাইতি/হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার/ ইসকন (১৬।১। ২০০৮)।

বিষ্ণুপ্রসাদ দাস-টাঠারিবাড়, নিরাপদ দাস-কাউকুণ্ডু, পশ্চি ম পল্লী।

Swastika
11 January - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT